فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

অতএব, দুর্ভোগ সেইসব নামাজীর যাহারা তাহাদের নামাজ সম্বন্ধেবে-খবর; যাহারা তাহা লোক-দেখানোর জন্য করে (অর্থাৎ রিয়া করে)।

لا يقبل الله عز و جل عملا فيه مثقال ذرة من ريا

"আল্লাহ পাক এমন কোন আমল কবুল করেন না, যাহাতে বিন্দু পরিমাণও রিয়া আছে।"

রিয়া

(লোকদেখানো ইবাদত)

মূল

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মোহাম্মদ খালেদ

প্রধান শিক্ষক, মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

সূচীপত্র

বিষয় ঃ | পৃষ্ঠা ঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রশংসায় আনন্দ ও নিন্দায় অসন্তুষ্ট হওয়া

বিষয় ঃ | পৃষ্ঠা ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم *

প্রথম অধ্যায়

খ্যাতি ও রিয়ার নিন্দা

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ "আমার উম্মতের জন্য আমি যেই বিষয়টির সর্বাধিক আশংকা করিতেছি, তাহা হইল রিয়া ও গোপন খাহেশ। অন্ধকার রাতে কঠিন পাথরের উপর কাল পিপীলিকা চলাচল করিলে যেমন টের পাওয়া যায় না, তদ্রূপ ইহাও অনুভব করা যায় না।"

এই কারণেই মানুষের চরম শত্রু এই রিয়া ও গোপন খাহেশের উপস্থিতি সম্পর্কে বড় বড় আলেমগণও অনুভব করিতে পারেন না। সুতরাং যাহারা আলেম নহে, এমন মূর্খ আবেদ ও মোত্তাকীদের পক্ষে তো উহা সম্পর্কে ওয়াকেফ হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। এই রিয়া হইল মানুষের জন্য চরম ক্ষতিকারক এক গোপন প্রতারণা। এই ক্ষতিতে আলেম, আবেদ, সাধক ও পরকালের পথিকগণ লিপ্ত। কারণ এই শ্রেণীর লোকেরা রিয়াজত-মোজাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে নিজেদের নফসকে পরাভূত করতঃ উহাকে যাবতীয় আত্মিক ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদতের প্রতি নিবিষ্ট করিয়া রাখেন। এমতাবস্থায় তাহাদের আত্মা বাহ্যিক অঙ্গ-অবয়ব দ্বারা কোনরূপ গোনাহ করিতে পারে না। তো রিয়াজত-মোজাহাদা ও আত্মার উপর ক্রমাগত যাতনার পর উহা হইতে মুক্তির একমাত্র যেই পথটি তাহাদের সম্মুখে খোলা থাকে তাহা হইল– নিজেদের নেক আমলসমূহ প্রকাশ করিয়া সাধারণ মানুষের ভক্তি–শ্রদ্ধা আকর্ষণ। সাধারণ মানুষের এই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের ফলে আত্মার উপর রিয়াজত-মোজাহাদার যাতনা লাঘব হইয়া তদস্থলে এক অনাবিল আত্মসুখ অনুভূত হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের এবাদত ও নেক আমলসমূহ প্রকাশ করিয়া বেড়ায় এবং এইরূপ কামনা করে যেন মানুষ আমাদের রিয়াজত ও এবাদত সম্পর্কে অবগত হয়। অর্থাৎ নিজেদের এবাদত

সম্পর্কে আল্লাহর অবগতিকে তাহারা যথেষ্ট মনে করে না। এই কারণেই মানুষের প্রশংসা লাভ করিয়া তাহারা তুষ্ট হয় আর আল্লাহর প্রশংসা করিয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না। তাহারা এই কথা ভাল করিয়া জানে যে, আমরা যদি এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হইয়া যাবতীয় কামনা-বাসনা বর্জনপূর্বক সন্দেহযুক্ত বিষয় হইতেও পরহেজ করিয়া চলি, তবে মানুষ আমাদের বুজুর্গীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিবে এবং লোক সমাজে আমাদের ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। লোকেরা আসিয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিবে এবং আমাদের দর্শন লাভকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় মনে করিবে। দোয়া ও ফয়েজ লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের শরণাপন্ন হইবে এবং কোন বিষয়ে আমরা যাহা সিদ্ধান্ত দিব তাহা মানিয়া লইবে। দেখিবামাত্র আমাদের খেদমত করিবে। মজলিসে সম্মানজনক আসন দিবে, বিনয়-বিনম্র আচরণ করিবে এবং আমাদের চাহিদার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে।

অর্থাৎ এই সব অবস্থায় তাহারা এমনই আত্মসুখ লাভ করে যে, উহার ফলে গোনাহ ও পাপাচার ত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না এবং পাবন্দির সহিত এবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকা খুব সহজ হইয়া যায়। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহাদের আত্মা যেই সুখ লাভ করিতেছে তাহা সমস্ত সুখের সার নির্যাস বটে। এমতাবস্থায় তাহারা মনে করে, আমাদের জীবন আল্লাহর জন্য নিবেদিত এবং আমরা অনুক্ষণ আল্লাহর এবাদত করিতেছি। অথচ তাহারা এমন গোপন খাহেশাত ও কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ যে, উহা কেবল প্রকৃত গুণীজনই উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহারা মনে করে, আমরা এখলাসের সহিত আল্লাহর আনুগত্য করিতেছি এবং আল্লাহ পাক যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা বর্জন করিয়া চলিতেছি। কিন্তু দুষ্ট নফস তাহাদের অন্তরে এমন গোপন খাহেশ স্থাপন করিয়া দেয় যেন উহার ফলে তাহারা নিজেদের এবাদত সমূহ মানুষের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহাদের মিথ্যা প্রশংসায় পরিতুষ্ট হয়। অতঃপর এই গোপন খাহেশের কারণেই তাহাদের এবাদতের ছাওয়াব বিনষ্ট হয় এবং তাহারা নিজেদেরকে নেক আমলের ফজিলত হইতে বঞ্চিত করে। এই পর্যায়ে তাহাদের নাম মোনাফেকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়– অথচ তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা মনে করিয়া থাকে। ইহা নফসের এক সূক্ষ্ম প্রতারণা। আল্লাহর নৈকট্যশীল ছিদ্দীকগণের পক্ষেই এই প্রতারণার জাল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

উপরের আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, রিয়া হইল, মানবাত্মার এক সর্বনাশ ব্যাধি এবং শয়তানের মস্ত বড় জাল। নিম্নে পর্যায় ক্রমে এই রিয়ার পরিচয়, উহার উৎপত্তি, উপকরণ, স্তর, প্রকার ভেদ এবং উহা হইতে আত্মরক্ষার উপায় বর্ণনা করা হইবে। তবে এই আলোচনার সূচনাপর্বে

আমরা 'জাহ্' তথা সুনাম-সুখ্যাতির উপর আলোকপাত করিতেছি।

সুনাম ও সুখ্যাতিকে বলা হয় জাহ্। এই সুনাম নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর এবং অখ্যাত থাকা নিরাপদ ও কল্যাণকর। অবশ্য কোনরূপ চেষ্টা-তদ্বির ও চাহিদা ছাড়াই যদি আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তি বিশেষকে দ্বীন প্রচারের স্বার্থে সুখ্যাতি দান করেন, তবে এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সুখ্যাতি ক্ষতিকর নহে।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

حب المرء من الشر إلا من عصمه الله ان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه

অর্থঃ "মানুষের অনিষ্টের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, কাহারো দ্বীন বা দুনিয়া বিষয়ে মানুষ তাহার দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিবে। তবে আল্লাহ পাক যাহাকে হেফাজত করেন তাহার কথা ভিন্ন।" (বায়হাকী)

সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) অনুরূপ এক বর্ণনা উল্লেখ করিয়া বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

يحسب المرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء ان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه · ان الله لا ينظر الى صوركم و لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم

অর্থঃ মানুষের অনিষ্টের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, মানুষ কাহারো দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তাহার দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিবে। তবে আল্লাহ পাক যাহাকে রক্ষা করেন তাহার কথা আলাদা। আল্লাহ তোমাদের ছুরত দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের আমল দেখেন। (তাবারানী আওসাত)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু সাঈদ! আপনি যখন পথ অতিক্রম করেন, তখন তো লোকেরা আপনার দিকেও ইশারা করে। তিনি বলিলেন, বর্ণিত হাদীসে এই ইশারার কথা বলা হয় নাই; বরং উহার অর্থ হইল, দ্বীনের মধ্যে কোন বেদআত জারী করার কারণে যদি মানুষ তাহার দিকে ইশারা করে কিংবা পার্থিব বিষয়ে কোন পাপাচার আবিষ্কার করার কারণে যদি সে ইশারার পাত্রে পরিণত হয়, তবে তাহা ক্ষতিকর।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হাদীষটির এমন ব্যাখ্যা দিলেন যে, অতঃপর

এই বিষয়ে আর কাহারো কোন প্রশ্ন রহিল না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ব্যয় কর কিন্তু নিজের দানশীলতার কথা প্রচার করিও না। নিজের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে তুলিয়া ধরিও না যে, উহার ফলে মানুষের নিকট তোমার সম্পর্কে জানাজানি হয় এবং তোমাকে লইয়া লোকেরা আলোচনা করে। তুমি বরং নীরবে-নিভৃতে বসবাস কর যেন গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার। ধার্মিক লোকদিগকে সন্তুষ্ট কর এবং পাপী লোকদিগকে অসন্তুষ্ট কর।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি পছন্দ করে, সে যেন আল্লাহকে সত্যায়ন করে না। হযরত আইউব সাখতিয়াবী (রহঃ) বলেন, যেই পর্যন্ত তুমি ইহা পছন্দ না করিবে যে, মানুষ যেন তোমার ঠিকানা ও পরিচয় জানিতে না পারে; সেই পর্যন্ত তুমি যেন আল্লাহর সত্যায়ন করিলে না।

হযরত খালেদ ইবনে মে'দানের মজলিসে যখন অধিক লোক সমাগম হইত, তখন তিনি খ্যাতির ভয়ে মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতেন। হযরত আবুল আলিয়ার নিকট তিন জনের বেশী লোক জড়ো হইলে তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিতেন।

একবার হযরত তালহা দেখিতে পাইলেন, প্রায় দশজন লোক তাহার পিছনে পিছনে আসিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, ইহারা লালসার মক্ষিকা এবং দোজখের ফড়িং। হযরত সোলাইমান ইবনে হানজালা বলেন, একবার আমরা হযরত উবাই ইবনে কাবের পিছনে পিছনে চলিতেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) এই দৃশ্য দেখিয়া চাবুক হাতে আগাইয়া আসিলেন। হযরত উবাই আরজ করিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি কি করিতেছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যেইভাবে আড়ম্বরের সহিত চলিতেছ, ইহা তোমার অনুসারীদের জন্য জিল্লতী এবং তোমার জন্য ফেৎনা।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথাও রওনা হইলেন। কতক লোক তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার পিছনে আসিতেছ কেন? আল্লাহর কসম! তোমরা যদি জানিতে পারিতে যে, আমি কি কারণে আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখি, তবে কেহই আমার পিছনে আসিতে না। তিনি আরো বলেন, আহাম্মক লোকেরাই নিজেদের পিছনে জুতার আওয়াজ শুনিয়া গর্বিত হয়। একবার কতক লোক হযরত হাসান (রাঃ)-কে অনুসরণ করিতেছিল। তিনি পিছনের দিকে তাকাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আমার সঙ্গে যদি তোমাদের কোন কাজ থাকে, তবে

আসিতে পার। অন্যথায় ইহা অসম্ভব নহে যে, এইভাবে পিছনে পিছনে চলার ফলে মোমেনের অন্তরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

এক ব্যক্তি প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মুহাইরিজের সঙ্গে সফরে রওনা হইল। এক পর্যায়ে তাহার সঙ্গ হইতে পৃথক হওয়ার সময় সে হযরত মুহাইরিজের নিকট আরজ করিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত মুহাইরিজ বলিলেন, এমনভাবে জীবনযাপন করিবে যেন তুমি মানুষকে চিনিবে বটে কিন্তু মানুষ যেন তোমাকে চিনিতে না পারে। পথ চলার সময় কাহাকেও সঙ্গে রাখিবে না। তুমি মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে কিন্তু মানুষ যেন তোমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা না করে।

হযরত আইউব (রহঃ) একবার সফরে বাহির হইলেন। এই সময় একদল মানুষ তাহার পিছনে পিছনে চলিতেছিল। এক পর্যায়ে তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি যদি এই কথা না জানিতাম যে, আল্লাহ তায়ালা আমার দিলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং আমার পিছনে পিছনে তোমাদের এইভাবের আগমন আমি অপছন্দ করি, তবে আমি আল্লাহর আজাবের আশংকা করিতাম। মা'মার বলেন, একবার আমি হযরত আইউব (রহঃ)-কে তাহার লম্বা জামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আগের যুগে লম্বা জামা পরিলে সুখ্যাতি অর্জন হইত বটে, কিন্তু বর্তমানে খাট জামা পরিলেই বুজুর্গী জাহির হইতে থাকে (এই কারণেই আমি লম্বা জামা ব্যবহার করি)।

জনৈক বুজুর্গ বলেন, একবার আমি আবু কেলাবের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বেশ মূল্যবান পোশাক পরিয়া সেখানে আগমন করিল। আবু কেলাব সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত লোকজনকে বলিলেন, তোমরা এই বাকশক্তিসম্পন্ন গাধা হইতে বাঁচিয়া থাক। (অর্থাৎ- বাহ্যিক চাক্‌চিক্যের মাধ্যমে তোমরা সুনাম ও খ্যতি অন্বেষণ করিও না।) হযরত ছাওরী (রহঃ) বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ দুইটি খ্যাতি হইতে বাঁচিয়া থাকিতেন। একটি হইল উৎকৃষ্ট পোশাকের খ্যাতি এবং অপরটি পুরাতন ও ছিন্ন পোশাকের খ্যাতি। কেননা, এই দুইটি পোশাকের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি সমানভাবে আকৃষ্ট হয়।

এক ব্যক্তি হযরত বিশর ইবনে হারিসের নিকট কিছু নসীহত প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, নিজেকে গোপন রাখ এবং হালাল খাদ্য গ্রহণ কর। শোয়াব (রহঃ) এই কথা বলিয়া ক্রন্দন করিতেন যে, হায়! জামে' মসজিদের লোকেরা পর্যন্ত আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। হযরত বিশর বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তির কথা জানি না, যেই ব্যক্তি সুখ্যাতি পছন্দ করে অথচ তাহার দ্বীন বরবাদ হয় নাই এবং মানুষের নিকট সে অপমানিত হয় নাই। তিনি আরো বলেন, যেই ব্যক্তি খ্যাতি কামনা করে সে পরকালের স্বাদ পায় না।

অখ্যাত থাকার ফজিলত

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لا بره منهم البراء بن مالك

অর্থঃ এলোমেলো কেশধারী, ধূলিধূসরিত, দুই চাদরওয়ালা এমন অনেক লোক আছে যাহাদের প্রতি মানুষ কোন গুরুত্ব দেয় না। অথচ তাহারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করিয়া কোন কথা বলিয়া ফেলে তবে আল্লাহ পাক তাহা অবশ্যই বাস্তবায়িত করেন– বারা ইবনে মালেক এমন লোকদের মধ্যে গণ্য।

(মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

رب ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره لو قال : اللهم انى اسئلك الجنة لاعطاه الجنة و لم يعطه من الدنيا شيئا

অর্থঃ দুই চাদরওয়ালা এমন অনেক লোক আছে যাহাদের প্রতি মানুষ কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। অথচ তাহারা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বসে, তবে আল্লাহ পাক তাহা পূরণ করেন। তাহারা যদি এইরূপ দোয়া করে– "আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করিতেছি" তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই জান্নাত দান করিবেন। যদিও দুনিয়াতে তাহাদিগকে কিছুই দেওয়া হয় না।" (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

الا ادلكم على اهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو اقسم على الله لابره و اهل النار كل مستكبر جواظ

অর্থঃ আমি কি তোমাদিগকে বেহেশতবাসীদের পরিচয় বলিব না? জান্নাতবাসী হইল এমন প্রত্যেক দুর্বল ও কমজোর মানুষ যে, তাহারা যদি আল্লাহর নামে কোন শপথ করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাহাদের শপথ পূরণ করিবেন। আর জাহান্নামবাসী হইল প্রত্যেক অহংকারী ও গোঁয়ার লোক।

(বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ان اهل الجنة كل اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له الذين اذا استأذنوا على الامراء لم يؤذن لهم و اذا خطبوا النساء لم ينكحوا و اذا قالوا لم ينصت لقولهم حوائج احدهم تتخلخل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم .

অর্থঃ তাহারাই জান্নাতবাসী, যাহাদের কেশ এলোমেলো, ধূলিধুসরিত এবং পোশাক মাত্র দুইটি চাদর। তাহাদের প্রতি কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না, শাসকদের নিকট যাইতে চাইলে উহার অনুমতি দেওয়া হয় না, কোন নারীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে সেই বিবাহ হয় না। তাহারা কোন কথা বলিলে গুরুত্বের সহিত তাহা কেহ শোনে না এবং তাহাদের অভাব-অনটন তাহাদের বুকের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরে। কিন্তু রোজ কেয়ামতে তাহাদের নূর যদি বন্টন করিয়া দেওয়া হয়, তবে সমস্ত মানুষের জন্য তাহা যথেষ্ট হইবে।

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ان من امتى من لو اتى احدكم يسأله دينارا لم يعطه اياه و لو سأله درهما لم يعطه اياه و لو سأله فلسا لم يعطه اياه و لو سأل الله تعالى الجنة لأعطاه اياها و لو سأله الدنيا لم يعطه اياها و منعها اياه الا لهوانها عليه رب ذى طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لا بره

অর্থঃ আমার উম্মতের মধ্যে কতক লোক এমন আছে, তাহারা কাহারো নিকট এক দেরহাম, এক দিনার বা একটি পয়সা চাহিলে কেহই তাহা দিবে না। কিন্তু তাহারা যদি আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করে, তবে তাহাদিগকে তাহা প্রদান করা হইবে। কিন্তু দুনিয়াতে কিছু চাহিলে দেওয়া হইবে না। দুনিয়াতে না দেওয়ার কারণ হইল– দুনিয়া মৃত্তিকাতুল্য। অনেক দুই চাদরওয়ালা এমন আছে, লোকেরা যাহাদিগকে কোন গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু তাহারা যদি আল্লাহর নমে কোন শপথ করে, তবে আল্লাহ তাহা অবশ্যই পূরণ করিবেন।

(তাবরানী আওসাত)

একদিন হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, হযরত মোয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, হে মোয়াজ! তুমি কাঁদিতেছ কেন?

হযরত মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

ان اليسير من الريا شرك و ان الله يحب الا تقياء الا خفياء الذين ان غابوا لم يفتقدوا و ان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة

অর্থঃ সামান্য রিয়াও শিরক। আল্লাহ তায়ালা এমন আত্মগোপনকারী মোত্তাকীগণকে পছন্দ করেন যাহারা উধাও হইয়া গেলে কেহই তাহাদিগকে খোঁজ করে না এবং উপস্থিত থাকিলেও কেহ তাহাদিগকে চিনে না। তাহাদের অন্তর হেদায়েতের নূর। সেই নূরের আলোকে তাহারা ধুলাবালি ও অন্ধকার অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়। (তাবরানী, হাকিম)

মোহাম্মদ ইবনে সুয়াইদ বর্ণনা করেন, একবার মদীনা শরীফে প্রচণ্ড খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই সময় জনৈক অখ্যাত দরবেশ মসজিদে নববীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি দিনরাত সেখানেই এবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকিতেন। এক দিন সকলে দোয়া কালামে লিপ্ত ছিল। এমন সময় অতি সাধারণ বেশভূষায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিল। লোকটি সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া এইভাবে দোয়া করিতে লাগিল– আয় পরওয়ারদিগার! আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, এই মুহূর্তে বৃষ্টি বর্ষণ কর। লোকটি দোয়া শেষ করিয়া হাত নামাইবার পূর্বেই গোটা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া এমন ভারী বর্ষণ শুরু হইল যে, অবশেষে মদীনাবাসীগণ পানিতে তলাইয়া যাওয়ার আশংকায় ফরিয়াদ করিতে লাগিল। তখন সেই লোকটি পুনরায় দোয়া করিল– পরওয়ারদিগার! তুমি যদি মনে কর, এই পরিমাণ পানিই তাহাদের জন্য যথেষ্ট, তবে বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দাও। লোকটির এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলেন। অতঃপর এই লোকটি মসজিদে এবাদতরত সেই দরবেশের শরণাপন্ন হইল। দরবেশ তখন মসজিদ হইতে বাহির হইয়া নিজের বাড়ীতে যাইতেছিলেন। লোকটি তাহার পিছনে পিছনে গিয়া তাহার বাড়ীটি চিনিয়া আসিল। পর দিন সকালে দরবেশের বাড়ীতে গিয়া তাহার নিকট আরজ করিল, আমি আপনার নিকট এই আরজি লইয়া আসিয়াছি যে, আপনি দোয়ার সময় খাসভাবে আমার কথা স্মরণ করিবেন। দরবেশ লোকটিকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি আমাকে দোয়া করিতে বলিতেছ? তোমার অবস্থা তো আমি গতকালই স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তুমি বরং এই কথা বল যে, এই মর্তবা তুমি কেমন করিয়া হাসিল করিলে। লোকটি বলিল, আমি আল্লাহ পাকের আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলি।

উহার ফলেই আল্লাহ পাক আমাকে এই সৌভাগ্য দান করিয়াছেন যে, আমি যাহা দোয়া করি তাহাই কবুল হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হে লোকসকল! তোমরা এলেমের ঝরণা এবং হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হও। রাতের প্রদীপ এবং স্বতেজ অন্তরের অধিকারী হও। তোমরা পুরাতন বস্ত্র ব্যবহার কর এবং নিজ গৃহে অবস্থান কর। আকাশের অধিবাসীগণ যেন তোমাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করে এবং জমিনের অধিবাসীগণ যেন তোমাদিগকে চিনিতে না পারে।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

يقول الله تعالى ان اغبط اوليائى عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة احسن عبادة ربه و اطاعة في السر و كان غامضا في الناس لا يشار إليه بالاصابع ثم صبر على ذالك

আল্লাহ পাক বলেন, আমার ওলীদের মধ্যে সে-ই ঈর্ষণীয় মোমেন যে নিজের উপর পরিবারের বোঝা কম রাখে, নামাজে অংশ গ্রহণ করে, উত্তমরূপে স্বীয় পালনকর্তার এবাদত করে এবং গোপনে আল্লাহর আনুগত্য করে। সে মানুষের দৃষ্টি হইতে এমন গোপন থাকে যে, মানুষ তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে না। অতঃপর সে এই অবস্থার উপর সবর করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় বান্দা হইল পরদেশীগন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, 'পরদেশী' দ্বারা আপনি কাহাদের কথা বুঝাইতেছেন? তিনি বলিলেন, যাহারা দ্বীনের জন্য নিজেদের আবাস ত্যাগ করে, তাহারাই পরদেশী। রোজ কেয়ামতে এই পরদেশীগণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট জমায়েত হইবে।

হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌঁছিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজের কোন কোন পুরস্কারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, আমি কি তোমাদিগকে এইরূপ পুরস্কার দেই নাই? আমি কি তোমাদের অপরাধ ঢাকিয়া রাখি নাই? আমি কি তোমাদিগকে অখ্যাত রাখি নাই?

খলীল ইবনে আহ্‌মাদ এইরূপ দোয়া করিতেন– আয় আল্লাহ! তোমার নিকট আমার মর্যাদা বৃদ্ধি কর, আমার নজরে আমাকে একেবারে হীন কর, আর মানুষের নিকট আমাকে মধ্যম স্তরের মর্যাদা দান কর। প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, আমার প্রত্যাশা– আমার অন্তর যেন মক্কা ও

মদীনার সেই পরদেশী ছালেহীনগণের সঙ্গে লাগিয়া থাকে, যাহারা অন্তহীন কষ্টেসৃষ্টে জীবন যাপন করে।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, জীবনে একদিনই আমার চক্ষু শীতল হইয়াছিল। সেই দিনের ঘটনা হইল– এক রাতে আমি সিরিয়ার কোন এক মসজিদে রাত্রি যাপন করিতেছিলাম। ঘটনাক্রমে সেই রাতে আমার ভয়ানক দাস্ত হইতে লাগিল। পরে মুয়াজ্জিন আমার অবস্থা টের পাইয়া সে আমার পা ধরিয়া টানাহেঁচড়া করিয়া আমাকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিল।

হযরত ফোজায়েল (রহঃ) বলেন, তোমার পক্ষে যদি অপ্রসিদ্ধ থাকা সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিও। কেননা, মানুষের প্রশংসা ও প্রসিদ্ধি লাভ কোন কল্যাণকর বিষয় নহে। তুমি যদি আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয় হও, আর মানুষ তোমাকে খারাপ জানে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

উপরের আলোচনা দ্বারা খ্যাতির নিন্দা এবং অখ্যাত থাকার ফজিলত জানা গেল। বস্তুতঃ মানুষের মূল উদ্দেশ্য 'খ্যাতি' ও 'সুনাম' নহে। বরং এই খ্যাতির মাধ্যমে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সম্মান পাইতে চাহে। তো এই খ্যাতিই হইল যত অনিষ্টের মূল। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, সুনাম ও খ্যাতি যদি অনিষ্টকর হইবে, তবে পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং শরীয়তের ইমামগণ কি কারণে এমন খ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন? পৃথিবীতে তাহাদের যেই খ্যাতি অর্জিত হইয়াছে, উহার কোন তুলনা হইতে পারে কি? আর কি কারণেইবা তাহারা খ্যাতিহীনতার ফজিলত হইতে বঞ্চিত রহিলেন? এই প্রশ্নের জবাব হইল– আসলে সত্ত্বাগতভাবে 'খ্যাতি' কোন নিন্দনীয় বিষয় নহে। রবং এই খ্যাতি অর্জন করা বা উহার জন্য চেষ্টা-তদ্বির করাই নিন্দনীয়। সুতরাং আল্লাহ পাক যদি নিজ ফজল ও করমে কোন ব্যক্তিবিশেষকে তাহার কোনরূপ চেষ্টা-তদ্বির ও প্রার্থনা ছাড়াই তাহাকে খ্যাতি দান করেন, তবে এই খ্যাতি অনিষ্টকর নহে। অবশ্য দুর্বল ব্যক্তিদের পক্ষে এই খ্যাতি অনিষ্টকর হইতে পারে। উহার উদাহরণ এইরূপ– মনে কর, একদল মানুষ পানিতে ডুবিয়া তলাইয়া যাইতেছে। এই বিপন্ন মানুষদের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি সাতার জানে। এখন তাহার এই সাতার জানার বিষয়টি অপরাপরদের মধ্যে খ্যাত না হওয়াই নিরাপদ। কেননা, তাহার সাতার জানার বিষয়টি যদি সকলের জানা থাকে, তবে সকলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজেরাও ডুবিবে এবং তাহাকেও ডুবাইয়া মারিবে। অবশ্য এই ব্যক্তি যদি শক্তিশালী হয়, তবে তাহার সাতারের খ্যাতি তাহার জন্য অনিষ্টকর নহে। বরং ভাল সাঁতারু সম্পর্কে জানা থাকাই উত্তম, যেন বিপদের সময় তাহার সহায়তায় প্রাণে রক্ষা পাওয়া যায়।

খ্যাতিপ্রীতির নিন্দা

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا

অর্থঃ এই পরকাল আমি তাহাদের জন্য নির্ধারিত করি, যাহারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে ও অনর্থ সৃষ্টি করিতে চাহে না।

(সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৮৩)

উপরোক্ত আয়াতে দুইটি বিষয় একত্রিত করা হইয়াছে। একটি হইল জাহ তথা ইজ্জত-প্রভাব ও খ্যাতি লাভের ইচ্ছা এবং অপরটি হইতেছে ফাসাদ সৃষ্টি করার ইচ্ছা। অতঃপর বলা হইয়াছে পরকাল এমন ব্যক্তিদের জন্য যাহারা এই দুইটি ইচ্ছা হইতে মুক্ত।

এরশাদ হইয়াছে–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ * اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ * وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাহাদের দুনিয়াতেই তাহাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করাইয়া দিব এবং তাহাতে তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। ইহারাই হইল সেইসব লোক আখেরাতে যাহাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নাই। তাহারা এখানে যাহাকিছু করিয়াছিল সবই বরবাদ করিয়াছে, আর যাহাকিছু উপার্জন করিয়াছিল, সবই বিনষ্ট হইল।" (সূরা হূদঃ আয়াত– ১৫-১৬)

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

حب المال و الجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل

অর্থঃ "মাল ও জাহ্ এর মোহ অন্তরে এমনভাবে নেফাক সৃষ্টি করে যেমন বৃষ্টির পানি সব্জি উৎপন্ন করে।" অন্য হাদীসে আছে–

ما ذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم بأسرع افسادا من حب الشرف و المال في دين الرجل المسلم

অর্থঃ "ছাগপালের মধ্যে দুইটি নেকড়ে ছাড়িয়া দিলে উহারা এত দ্রুত ছাগপালের ক্ষতি করে না– সম্পদ ও গৌরবের মোহ মুসলমানদের দ্বীনকে যতটা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত করে।"

জাহ্ এর অর্থ এবং উহার হাকীকত

প্রকাশ থাকে যে, জাহ ও মাল হইতেছে দুনিয়ার দুইটি স্তম্ভ। মাল বা সম্পদের অর্থ– পার্থিব জীবনে উপকারী ও প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহের মালিক হওয়া। আর জাহ্ বলা হয় সেইসব অন্তর সমূহের মালিক হওয়াকে, যাহাদের নিকট হইতে সম্মান ও আনুগত্য প্রত্যাশা করা হয়। মালদার ও বিত্তবান ব্যক্তি যেমন টাকা-পয়সার মাধ্যমে নিজের যাবতীয় খাহেশাত ও কামনা-বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়; তদ্রূপ জাহ্ এর মালিক তথা সম্পদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিও মানুষের অন্তরের মালিক হইয়া তাহাদিগকে নিজের প্রয়োজন ও স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়। অর্থবিত্ত যেমন বিভিন্ন পেশা, কর্ম ও কারিগরির মাধ্যমে সঞ্চয় করা হয়, তদ্রূপ মানুষের অন্তরও উন্নত চরিত্র, উদারতা ও মহানুভবতা– ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করা হয়। মানুষের অন্তর বশীভূত হয় বিশ্বাসের মাধ্যমে। যেন কোন মানুষের অন্তর যদি এই কথা বিশ্বাস করে যে, অমুক ব্যক্তির মধ্যে অমুক গুণটি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, তখন এই বিশ্বাসের কারণেই অন্তর তাহার প্রতি আকৃষ্ট ও বশীভূত হইয়া পড়িবে। এই বিশ্বাস যত মজবুত ও দৃঢ় হইবে, সেই অনুপাতেই অন্তর তাহার প্রতি অনুগত হইবে। এখন বাস্তবেও আলোচ্য গুণটি সেই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান হওয়া জরুরী নহে; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশ্বাসমতে গুণটি সেই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান হওয়াই যথেষ্ট। এই কারণেই অনেক সময় দেখা যায় মানুষের অন্তর হয়ত এমন কোন বিষয়কে পরিপূর্ণ গুণ ও কীর্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে, বাস্তবে যাহা আদৌ কোন গুণ বা কীর্তি নহে। কিন্তু অন্তর এই অমূলক বিশ্বাসের কারণেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছে। কারণ, আনুগত্য হইতেছে অন্তরের একটি হালাত যাহা বিশ্বাসের অনুগামী হইয়া থাকে।

সম্পদের অভিলাষী ব্যক্তি যেমন ইহা কামনা করে যে, সে যেন অনেক গোলাম-বাঁদীর মালিক হইতে পারে, তদ্রূপ যশ-প্রভাব ও সম্মানের অভিলাষী ব্যক্তিও ইহা কামনা করে, স্বাধীন ও মুক্ত মানুষেরা যেন তাহার আনুগত্য ও গোলামী করিতে থাকে এবং সকল মানুষের অন্তরে যেন তাহার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এইভাবেই সে অনুগত লোকজনকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করিতে চাহে।

সম্পদশালী ব্যক্তি যেমন মানুষের আনুগত্য ও গোলামী কামনা করে, তদ্রুপ যশ-খ্যাতি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিও মানুষের আনুগত্য কামনা করে। তবে এই ক্ষেত্রে যশ ও প্রভাবপ্রিয় ব্যক্তির কামনা প্রবল ও নিরঙ্কুশ। কারণ, সম্পদশালী ব্যক্তি জোরপূর্বক মানুষকে গোলাম বানাইয়া তাহাদের আনুগত্য আদায় করে। অর্থাৎ এই সকল লোক স্বেচ্ছায় মনিবের গোলামী মানিয়া লয় না। এই ক্ষেত্রে যদি তাহাদিগকে এখতিয়ার দেওয়া হয়, তবে এক মুহূর্তের জন্যও তাহারা সেই সম্পদশালী ব্যক্তির আনুগত্য করিতে রাজী হইবে না। পক্ষান্তরে মানুষ স্বেচ্ছায় প্রভাবশালী ব্যক্তির আনুগত্য গ্রহণ করে এবং এই আনুগত্যকে তাহারা গৌরবের বিষয় মনে করে। প্রভাবশালী ব্যক্তিটিও এইরূপ কামনা করে যেন মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে তাহার আনুগত্য গ্রহণ করে এবং এই আনুগত্য যেন তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, 'জাহ্' অর্থ হইতেছে মানুষের কোন গুণ ও কীর্তি সম্পর্কে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হওয়া এবং এই বিশ্বাসের আলোকেই অন্তরে সেই ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই বিশ্বাস যত মজবুত হইবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যও সেই অনুপাতেই প্রবল হইবে। মানুষের আনুগত্য যত বেশী পাওয়া যাইবে সেই অনুপাতেই অধিক লাভবান হওয়া যাইবে।

খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ফল হইল, যেই ব্যক্তির আনুগত্য করা হয় সেই ব্যক্তির প্রশংসা ও গুণ-বর্ণনা করা হয়। আর মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসও অনেকটা এইরূপ যে, মানুষ যাহার আনুগত্য করে তাহার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। জাহ্ এর আরেক ফল হইল, খেদমত ও সাহায্য-সহযোগিতা করা। কারণ, অনুগত ব্যক্তি তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি অনুযায়ী সেই ব্যক্তির খেদমত ও সাহায্য-সহযোগিতা করিতে পারাকে নিজের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করে। এই পর্যায়ে সেই ব্যক্তিও তাহাদের পক্ষ হইতে নিরঙ্কুশ আনুগত্য আদায় করিতে সক্ষম হয় এবং নিজের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে তাহাদিগকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। তাহারাও সেই ব্যক্তির আনুগত্য ও সেবাযত্ন করিয়া এক অনাবিল আত্মসুখ অনুভব করে। সকল কাজে তাহাকে আগে আগে রাখে এবং কোন বিষয়েই তাহার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে না। সর্বদা তাহাকে ইজ্জত করে এবং দেখিবামাত্র আগে ছালাম করে। মজলিসের শ্রেষ্ঠ আসনটি দিয়া তাহাকে বরণ করে এবং সকল কাজেই তাহার সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেয়।

তো মানুষের প্রতি এই আনুগত্য ও ভক্তি তখনই পয়দা হয় যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন গুণ ও কীর্তির বিশ্বাস অন্তরে স্থাপিত হয়। মানুষের সেই গুণ কীর্তি বিভিন্ন রকম হইতে পারে। যেমন সেই লোকটি হয়ত ভাল আলেম-আবেদ বা উন্নত চরিত্রের অধিকারী কিংবা সে আকর্ষণীয় রূপের অধিকারী, ভাল বংশের লোক, সরকারী ক্ষমতা বা শারীরিক শক্তির অধিকারী– ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইলে উহা দ্বারা মানুষের অন্তর জয় করা যায়।

জাহ্ পছন্দনীয় হওয়ার কারণ

জাহ্ অর্থ মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া। অর্থাৎ নিজের কোন কম বা কীর্তির খ্যাতির মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাহাদের অন্তর জয় করিয়া লওয়া। এখন আমরা আলোচনা করিব এই জাহ্ মানুষের নিকট এত প্রিয় কেন? জাহ পছন্দ করে না এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাইবে। যদি কাহারো অন্তর উহার প্রতি একেবারেই নির্লিপ্ত হয়, তবে মনে করিতে হইবে– প্রচুর মোজাহাদা ও সাধনার পরই তাহা সম্ভব হইয়াছে।

বস্তুতঃ মানুষ যেই কারণে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে মোহাব্বত করে, ঐ একই কারণে 'জাহ্' এর প্রতিও আকৃষ্ট হয়। বরং সোনা-রূপার চাইতে জাহ্ এর প্রতিই মানুষের আকর্ষণ বেশী। স্বর্ণ ও রৌপ্য যদি ওজনে বরাবর হয়, তবে স্বর্ণের প্রতিই মানুষের আকর্ষণ বেশী হইবে। কেননা, একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, সত্তাগতভাবে টাকা পয়সা মানুষের মূল উদ্দেশ্য নহে। কারণ, এই টাকা পয়সা না খাওয়া যায়, না পরিধান করা যায়, না উহাকে বিবাহ শাদী করা যায়। সুতরাং এই মুদ্রা ও পাথরের মধ্যে দৃশ্যতঃ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু উহার পরও টাকা পয়সা মানুষের নিকট প্রিয় হওয়ার কারণ হইল উহা দ্বারা মানুষের যাবতীয় কার্য উদ্ধার হয় এবং মনের সর্ববিধ কামনা-বাসনা এই টাকা পয়সা দ্বারাই পূরণ হয়। জাহ্ এর অবস্থাও অনুরূপ। কেননা, আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, জাহ্ এর অর্থ হইতেছে মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া। সোনারূপার মালিক হওয়ার ফলে যেমন যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের শক্তি অর্জন করা যায়; তদ্রূপ মানুষের অন্তরের মালিক হইতে পারিলে এবং তাহাদিগকে অনুগত করিতে পারিলেও নিজের যাবতীয় কার্যোদ্ধারের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জাহ্ ও মালের মোহাব্বতের কারণ অভিন্ন। এই কারণেই মানুষ জাহ্ ও মাল এই উভয়টিকেই মোহাব্বত করে। কিন্তু তবুও মাল অপেক্ষা জাহ্ এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ প্রবল। সুতরাং মানুষ মাল বা সম্পদ অপেক্ষা জাহকেই অধিক মোহাব্বত করে।

মাল অপেক্ষা জাহ্ অধিক কাম্য হওয়ার কারণ

মোটামুটি তিনটি কারণে মাল অপেক্ষা জাহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়–

প্রথম কারণ

প্রথমতঃ মাল দ্বারা জাহ্ অর্জন করা অপেক্ষা জাহ্ দ্বারা মাল অর্জন করা অনেক সহজ। অর্থাৎ ধনসম্পদ ও টাকা-পয়সা দ্বারা সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা কঠিন বটে, কিন্তু সেই তুলনায় সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা সম্পদ অর্জন করা অনেক সহজ। সুতরাং দেখা যাইতেছে– এমন কোন আলেম বা আবেদ যিনি নিজের বুজুর্গী বা উন্নত আখলাকের মাধ্যমে মানুষের অন্তর জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি খুব সহজে সম্পদও সঞ্চয় করিতে পারেন। কেননা, সাধারণতঃ মানুষ যাহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তাহার জন্য অকাতরে সম্পদ ব্যয় করিতে কিছু মাত্র দ্বিধাবোধ করে না। তবে জাহ্ বঞ্চিত কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক কোন উপায়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী হইলেও তাহার পক্ষে এই সম্পদ দ্বারা জাহ্ তথা সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা সহজ হয় না।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ জাহ্ দ্বারা মাল কামাইতে পারে বটে, কিন্তু মাল দ্বারা জাহ্ কামাইতে পারে না। এই কারণেই মানুষের নিকট জাহ্ অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয় হয়।

দ্বিতীয় কারণ

মাল বা সম্পদ বিভিন্ন কারণেই বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যেমন চুরি হওয়া, ছিনতাই হওয়া বা সরকার কর্তৃক ক্রোক করা– ইত্যাদি। সুতরাং উহার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্তহীন দুশ্চিন্তা ও বিপুল শ্রম ব্যয় করিতে হয়। পক্ষান্তরে মানুষের অন্তরের মালিক হইলে এই জাতীয় কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় না। মানুষের অন্তর এমন এক গোপন ভাণ্ডার যাহা কোন মানুষের পক্ষে বিনষ্ট করা সম্ভব হয় না এবং কোন চোর-ডাকাতও তথা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না। সম্পদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক স্থাবর সম্পদ হইল জমিন ও বাড়ী-ঘর। কিন্তু উহাও বেদখল হইয়া যাওয়ার আশংকা হইতে মুক্ত নহে। সুতরাং উহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তৎপর থাকিতে হয়। কিন্তু আত্মিক সম্পদের জন্য কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় না। সত্তাগতভাবেই উহা নিরাপদ। অর্থাৎ 'জাহ' চুরি-ডাকাতি ও বেদখল হইয়া যাওয়ার আশংকা হইতে নিরাপদ। অবশ্য এই আত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে যেই আশংকা সতত বিদ্যমান থাকিতে পারে তাহা হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গোমরাহ করিয়া দেওয়া কিংবা তাহার সমালোচনা ও বদনাম করিয়া তাহার উপর হইতে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া। অবশ্য এইরূপ সম্ভাবনা খুবই কম এবং এইরূপ হইলেও উহার মোকাবেলা করা খুব কঠিন নহে। তাহা ছাড়া এইসব ক্ষেত্রে ভক্তি-শ্রদ্ধা এমনই প্রবল হয় যে, দুষ্ট লোকদের নিছক সমালোচনার কারণেই তাহা নষ্ট হইয়া যায় না।

তৃতীয় কারণ

প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পদের উপর প্রবল ও প্রাধান্য হওয়ার তৃতীয় কারণ হইল– মানুষের অন্তরের মালিকানা বা প্রভাব-প্রতিপত্তি একটি সংক্রামক ও ক্রমঃগতিশীল বিষয়। কোনরূপ চেষ্টা-তদ্বির ও পরিশ্রম ছাড়াই উহার

ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। কারণ মানুষের অন্তর যখন কাহারো ব্যাপারে ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তাহার এলেম ও আমল দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন মুখ সেই ব্যক্তির গুণাবলী প্রশংসা করিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস হইল- সে যখন আন্তরিকতার সহিত কোন বিষয়ে আস্থাশীল ও বিশ্বাসী হয়, তখন উহা অপরের নিকটও প্রকাশ করিয়া বেড়ায়। এইভাবেই উহা ক্রমে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং যাহারা শোনে তাহারাও সেই ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ মানুষের সুনাম ও প্রভাব এই প্রক্রিয়ায় গ্রাম, শহর ও দেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কত দূর পর্যন্ত যে ছড়াইয়া পড়ে উহার কোন ইয়ত্তা নাই। পক্ষান্তরে সম্পদের ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান নহে। সম্পদের মালিক যথাযথভাবে চেষ্টা করিলেই উহার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অন্যথায় দিনে দিনে উহা বিনষ্ট ও নিঃশেষ হইয়া যাইতে বাধ্য। অর্থাৎ সম্পদ হইল এমন স্থবির বস্তু যাহা স্বতস্ফূর্তভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। উহার পিছনে কেহ মেহনত করিলেই উহার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। কিন্তু জাহ্ এর অবস্থা সম্পূর্ণ উহার বিপরীত। জাহ্ সতত বর্ধনশীল এবং উহা কোথাও স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে না। এই কারণেই জাহ্ তথা সম্মান ও প্রতিপত্তির তুলনায় মাল বা ধনসম্পদের গুরুত্ব অতি নগন্য।

জাহ্ ও মালের মোহাব্বতে আধিক্যের উপকরণ

প্রকাশ থাকে যে, জাহ্ ও মালকে মানুষ এই কারনে মোহাব্বত করে যে, এই দুইটি বস্তু দ্বারা জীবনের সর্ববিধ উপকারী বিষয় হাসিল করা যায় এবং ক্ষতিকারক বিষয় হইতেও আত্মরক্ষা করা যায়। আরো সোজা কথায়- জীবনের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ হইতে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যেই জাহ্ ও মালকে মোহাব্বত করা হয়। এখানে হয়ত কেহ প্রশ্ন করিতে পারে- আমরা তো এমন অনেক বিত্তবানের কথা জানি, যাহারা পর্যাপ্ত সম্পদের মালিক হওয়ার পরও কেমন করিয়া আরো বিপুল সম্পদের পাহাড় গড়িয়া তোলা যায় কেবল উহার ফিকিরেই লাগিয়া আছে। অর্থাৎ তাহারা যেন একটি সোনার খনির মালিক হওয়ার পর কেমন করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় খনিটি হস্তগত করা যাইবে উহারই চেষ্টা করিতেছে। জাহ্ ও প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্রেও ঐ একই অবস্থা। কেমন করিয়া ইজ্জত-সম্মান ও সুনাম দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িবে- এই ফিকির ও চেষ্টায় তাহাদের কোন বিরাম নাই। তাহারা কামনা করে যেন দূর দেশগুলিতেও তাহাদের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে, অথচ এই বিষয়ে সে নিশ্চিত যে, সেইসব দেশে গমন করা হয়ত কোন দিনই তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। সেইসব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে হয়ত তাহার কোন দিন সাক্ষাতও হইবে না। তাহাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ ইজ্জত-সম্মান পাওয়ারও কোন

সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ তাহাদের পক্ষ হইতে কোন ভাবেই সে উপকৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু তবুও এই অহেতুক চাহিদায় মানুষের আগ্রহের কোন অন্ত নাই। এই কথা সকলেই স্বীকার করিবে যে, জাহ্ ও মালের এই অতিরিক্ত চাহিদার পিছনে না মানুষের ধর্মীয় কোন ফায়দা আছে, না পার্থিব। কিন্তু তবুও কি কারণে মানুষ এই অনাবশ্যক সম্পদ ও সম্মানের প্রতি এতটা আগ্রহী হয়?

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব হইল- মানুষ প্রকৃত অর্থেই জাহ্ ও মাল তথা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদকে মোহাব্বত করে। উহার কারণ দুইটি। প্রথম কারণটি প্রকাশ্য ও সর্বজন বিদিত। দ্বিতীয় কারণটি গোপন। এই দুইটি কারণের মধ্যে দ্বিতীয় কারণটি বড় ও মুখ্য। এই দ্বিতীয় কারণটি এমনই সূক্ষ্ম যে, সাধারণ লোকেরা তো বটেই বরং শিক্ষিত ও বিচক্ষণ লোকেরাও উহার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফ নহে। কেননা, এই কারণটি নফসের আভ্যন্তরীণ শিরা উপশিরা ও স্বভাবের গোপন চাহিদার সাহায্যে অন্তরে অবস্থান করে। তো এই বাতেনী বিষয়টির খবর কেবল সেই সব লোকেরাই বলিতে পারিবে, যাহারা বাতেনী জগতের সহিত পরিচিত।

প্রথম কারণঃ ভয় দূর করা

মানুষের স্বভাব হইল- নিজের নিকট পর্যাপ্ত সম্পদ থাকিবার পরও ভবিষ্যতে আর্থিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করিতে থাকা। মানুষের আশার যেহেতু কোন শেষ নাই, সেহেতু সে কি পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করিবে উহারও কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। আর তাহার অন্তরে অনুক্ষণ এই আশংকা লাগিয়াই থাকে যে, আমার সম্পদ নিঃশেষ হইয়া আমি আবার সম্বলহীন হইয়া যাই কি-না। মনের ভিতর এই আশংকা সৃষ্টি হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্বানুরূপ সম্পদ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত সেই আশংকা দূর হয় না। সে মনে করে, কোন কারণে প্রথমোক্ত সম্পদ বিনষ্ট হইয়া গেলে যেন দ্বিতীয় সম্পদ উহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। দুনিয়ার মোহাব্বত মানুষকে এই ধারণা দিয়া রাখে যে, আমি এই পৃথিবীতে সুদীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিব। আমার জীবন যত দীর্ঘ হইবে, জীবনের প্রয়োজনও সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর যে কোন সময় কোন দুর্ঘটনা ও দুর্বিপাকে আমার সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই ধারণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সর্বদা উৎকণ্ঠিত ও ভীত করিয়া রাখে এবং এই আশংকা হইতে নিজেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সর্বদা সে টাকা-পয়সা রোজগারের ফিকিরে পেরেশান থাকে। সে মনে করে, কোন দুর্ঘটনায় আমার কিছু সম্পদ নষ্ট হইয়া গেলেও যেন অবশিষ্ট সম্পদ আমাকে রক্ষা করিতে পারে- এই পরিমাণ সম্পদ অবশ্যই আমার সঞ্চয়ে থাকিতে হইবে। এই আশংকার কারণেই সম্পদের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণকে সে নিজের

জন্য যথেষ্ট মনে করিতে পারে না। এই কারণেই এই শ্রেণীর লোকদের সম্পদের চাহিদার কোন সীমা থাকে না এবং গোটা দুনিয়ার মালিক হইয়া যাওয়ার পরও যেন তাহাদের সম্পদের খাহেশ মিটে না।

জাহ্ তথা সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহাব্বতের কারণও মোটামুটি অনুরূপ। যেই ব্যক্তি ইহা কামনা করে যে, বিদেশ ও দূরদেশের লোকদের অন্তরেও যেন আমার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পয়দা হয়, বস্তুতঃ এই ব্যক্তিও সর্বদা এমন আশংকায় শঙ্কিত থাকে যে, জীবন যাত্রার কোন অশুভ ক্ষণে যদি আমাকে দেশান্তরিত হইয়া সেই দেশে বসবাস করিতে হয় কিংবা সেই দেশের লোকেরা যদি এই দেশে আসিয়া বসবাস শুরু করে, তবে এই ক্ষেত্রে আমার পক্ষেও তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের অন্তরে যদি আমার প্রভাব ও শ্রদ্ধা না থাকে, তবে আমি কেমন করিয়া তাহাদের সাহায্য লাভ করিব? যাহাই হউক, এইরূপ আশংকা একেবারে অমূলক নহে এবং দূরে অবস্থানকারীদের সাহায্যের প্রয়োজন ও তাহা প্রাপ্তি সম্ভব হইতেও পারে।

দ্বিতীয় কারণ

জাহ্ ও মালের মোহাব্বতের আধিক্যের এই দ্বিতীয় কারণটিই অধিক প্রবল ও মজবুত। উহার মূল কথা হইল– রূহ একটি আমরে রাব্বানী বা আল্লাহর হুকুম। যেমন কালামে পাকে রূহ সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে–

وَ يَسْـئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ، قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ =

অর্থঃ "তাহারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলিয়া দিন, রূহ্ আমার পালনকর্তার হুকুম বিশেষ।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ আয়াত ৮৫)

মানুষের রূহ আত্মা রব্বানী হওয়ার তাৎপর্য হইল, উহার সম্পর্ক আধ্যাত্মিক জগতের গোপন রহস্যাবলির সহিত সংশ্লিষ্ট। এইসব গোপন ভেদ প্রকাশ করার অনুমতি নাই। কেননা, উহা প্রকাশ করার অনুমতি থাকিলে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূহ এর হাকীকত এবং উহার গোপন রহস্যাবলী অবশ্যই প্রকাশ করিতেন। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে ইহার অধিক কিছু আলোচনার পূর্বে এতটুকু জানা আবশ্যক যে, মানুষের আত্মা ও ক্বলব চারি প্রকার স্বভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়–

১. পাশবিক স্বভাব, যেমন– আহারাদি গ্রহণ ও সহবাস ইত্যাদি।
২. হিংস্র স্বভাব, যেমন– হত্যা খুনখারাবী ও মারামারি ইত্যাদি।
৩. শয়তানী স্বভাব, যেমন– ধোঁকা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ইত্যাদি।
৪. রাব্বানী স্বভাব, যেমন– ইজ্জত, সম্মান, অহংকার ও বড়ত্ব ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সমূহের সহিত মানবাত্মার সংশ্লিষ্টতার কারণ

হইল– মানব স্বভাব কয়েকটি উসূল ও নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত। এইসব সূক্ষ্ম বিষয়ের হাকীকত বর্ণনা করিতে হইলে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করিতে হয়। আমরা এখানে কেবল উহার একটি বিষয়ের উপরই আলোচনা করিব যে, মানবের স্বভাব-প্রকৃতিতে রাব্বানী স্বভাব বিদ্যমান। এই কারণেই মানুষ রবুবিয়ত ও কর্তৃত্ব পছন্দ করে। এখানে রবুবিয়ত অর্থ কর্তৃত্ব ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে অনন্যতা এবং অস্তিত্বের ক্ষেত্রে স্থিতি ও নিরঙ্কুশ অধিপত্য। কারণ, অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অপর কাহারো অংশীদারিত্ব বিদ্যমান হইলে নিরঙ্কুশ অধিপত্য খর্ব হইতে বাধ্য। যেমন সূর্যের কৃতিত্ব হইল নিজের অস্তিত্ব এবং আপন ভুবনে সে একক ও অনন্য সত্তার অধিকারী। তাহার সঙ্গে যদি অপর কোন সূর্যও থাকিত, তবে ইহা তাহার একক সত্তাকে খর্ব করিত এবং ইহাকে তাহার জন্য মর্যাদাহানীকরও মনে করা হইত। কেননা, তখন আর এইরূপ বলা যাইত না যে, সূর্য তাহার কৃতিত্বের ক্ষেত্রে একক ও অনন্য। তো অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একক ও অনন্য হইলেন আল্লাহ পাক। কেননা, তিনি একক, অভিন্ন এবং তাঁহার কোন শরীক নাই। আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের বাহিরে আর যাহাকিছু বিদ্যমান, উহা আল্লাহ পাকের কুদরতেরই নিদর্শন মাত্র।

মোটকথা, রবুবিয়তের অর্থ হইল, আপন অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একক ও অনন্য সত্তার অধিকারী হওয়া। স্বভাবগতভাবে প্রতিটি মানুষই চায় আপন কর্তৃত্ব ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে একক ও অনন্য হইতে। কিন্তু সে তাহা হইতে পারে না। মানুষ চায় কামেল হইতে, কিন্তু পরিপূর্ণ কামেল হওয়ার তাহার শক্তি নাই। উবুদিয়াত ও দাসত্ত মানুষের কাম্য নহে; স্বভাবগতভাবেই সে রবুবিয়াতে আকৃষ্ট। মানুষের রূহ যেহেতু একটি আমরে রাব্বানী বা আল্লাহ পাকের হুকুম বিশেষ, সুতরাং এই নেসবত ও সূত্র ধারার কারণেই রবুবিয়তের প্রতি মানুষের এই আগ্রহ। তো মানুষ কামালিয়াতের শীর্ষ শিখরে পৌঁছাইতে না পারিলেও কামালকে সে পছন্দ করে এবং উহার প্রতি তাহার আগ্রহ কখনো লুপ্ত হয় না। মানুষ বরং সেই কামালিয়াতের কল্পনাতেও এক প্রকার আত্মসুখ অনুভব করে। পৃথিবীর বিদ্যমান প্রতিটি বস্তুই নিজের সত্তা ও বৈশিষ্ট্য সত্তাকে মোহাব্বত করে এবং ধ্বংস ও বিনাশকে ঘৃণা করে। সুতরাং স্বভাবগত ভাবেই মানুষ নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যকে ভালবাসে। বিদ্যমান বস্তুসমূহে মানুষের প্রাধান্য তখনই প্রমাণিত হইবে, যখন নিজের ইচ্ছামত ঐগুলিকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে। সুতরাং ইহাও প্রমাণিত হইল যে, বস্তু সমূহের উপর প্রাধান্য লাভ মানুষের নিকট প্রিয়।

মওজুদাতের প্রকার ভেদ

মওজুদাত তথা বিদ্যমান বস্তু সমূহ কয়েক প্রকার। কতক এইরূপ যাহা

কোনরূপ বিবর্তন ও পরিবর্তন মানিয়া লইতে সম্মত নহে। যেমন আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত। আবার কতক এইরূপ যে, উহারা পরিবর্তন মানিয়া লয় বটে, কিন্তু কোন মানুষের কর্তৃত্ব উহাদের উপর চলে না। যেমন আসমান, তারকা, জ্বিন, ফেরেশতা, পাহাড় পর্বত ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকারের মধ্যে এমনসব বস্তু অন্তর্ভুক্ত যেইগুলিতে মানুষ প্রভাব খাটাইতে পারে। যেমন– জমিন, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ, জীব-জন্তু ইত্যাদি। মানুষের ক্বলব বা অন্তরও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

বিদ্যাগত প্রাধান্যের বাসনা

মোটকথা, উপরের আলোচনা দ্বারা ইহা জানা গেল যে, মওজুদাত ও বিদ্যমান বস্তু সমূহের মধ্যে কতক এইরূপ যে, উহাতে মানুষের শক্তি প্রয়োগের কোন সুযোগ নাই। যেমন আল্লাহ পাকের জাত, ফেরেশতা, আসমান ইত্যাদি। আবার কতক এইরূপও আছে যেইগুলির উপর মানুষ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। যেমন– জমিনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিবিধ পদার্থ ও জীব-যন্তু ইত্যাদি। এই কারণেই মানুষ এইরূপ কামনা করে যে, আমরা যখন কোন ভাবেই আসমানের উপর নিজেদের প্রভাব খাটাইতে পারিব না, তবে অন্ততঃ সৌর তথ্যাবলি এবং আকাশ সম্পর্কিত এলেম এবং উহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য ও তথ্যাবলীর এলেম হাসিল করিয়া হইলেও আকাশের উপর আমাদের একটা দখল ও প্রাধান্য থাকিতে হইবে। কেননা, কোন বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করাকেও সেই বিষয়ের উপর প্রাধান্য লাভের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। এই প্রাধান্য লাভের বাসনাই মানুষকে আল্লাহ, ফেরেশতা, আকাশ, তারকা, পাহাড় ও সমূদ্র ইত্যাদির রহস্যাবলী সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করিতে বাধ্য করিয়াছে। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গটির সার কথা হইল– মানুষ যখন কোন শিল্প ও সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার ও শক্তি প্রয়োগে অক্ষম হয় তখন সে ঐ বিষয়ের তথ্যাদি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হইয়া এলমী প্রাধান্য অর্জন করিতে আগ্রহী হয়।

এদিকে ভূপৃষ্ঠের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ কেবল এলমী প্রাধান্য অর্জন করাকেই যথেষ্ট মনে করে না। বরং এই ক্ষেত্রে সে শক্তি ও প্রভাব খাটানোর প্রাধান্য অর্জন করিতে চায়। যেন নিজের ইচ্ছামত উহাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারে। জমিনের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ দুই প্রকার। প্রথমতঃ আজসাম এবং দ্বিতীয়তঃ আরওয়াহ। আজসামের উদাহরণ যেমন– টাকা পয়সা ও অপরাপর বস্তুসমূহ। এইসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে মানুষের কামনা হইল, যেন নিজের ইচ্ছামত ও কার্যকরভাবেই উহাতে নিজের ক্ষমতা খাটাইতে পারে এবং যেইভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই উহা ব্যবহার করিতে পারে। অর্থাৎ যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাইবে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া দিবে,

যাহাকে ইচ্ছা না দিবে– ইত্যাদি। কোন বস্তুর উপর এই ধরনের এখতিয়ার অর্জন করাকে বলা হয়, সেই বিষয়ের উপর তাহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। আর এই ক্ষমতাই হইল কামাল বা কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

কামাল রবুবিয়াতেরই একটি সিফাত। মানুষ স্বভাবগতভাবেই এই রবুবিয়াত ও কর্তৃত্বের অভিলাষী। এই কারণেই মানুষ মাল ও ধনসম্পদকে মোহাব্বত করে। চাই সেই সম্পদ তাহার লেবাস-পোশাক, আহারাদি ও নফসের খাহেশাত পূরণের কাজে আবশ্যক নাই বা হউক। একই কারণে সে গোলাম-বাঁদীকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে এবং স্বাধীন মানুষকে নিজের অনুগত বানাইতে চাহে– যদিও বল প্রয়োগের মাধ্যমেই তাহাদের দ্বারা কাজ আদায় করিতে হউক না কেন। অনেক সময় মানুষ নিজের মতই অপরাপর মানুষের উপর প্রভাব খাটায়। কিন্তু এইভাবে জোর করিয়া মানুষের আত্মাকে বশ করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। কেননা, মানুষের স্বভাব হইল, সে অপর কাহারো বিশেষ কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের কারণে আকৃষ্ট না হইলে তাহার অনুগত হয় না। অবশ্য এই ক্ষেত্রে ক্রোধ ও জাঁকজমক কৃতিত্বের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে বটে। কেননা, ক্রোধ ও জাঁকজমকের মাধ্যমেও মানুষকে সাময়িকভাবে বশ করা যায় এবং উহার ফলেও ক্ষমতার স্বাদ কিছুটা অনুভূত হয়।

এখন অবশিষ্ট রহিল মানুষের আত্মা ও ক্বলব। এই পৃথিবীতে আত্মা ও ক্বলবের মত মূল্যবান বস্তু আর কিছু নাই। মানুষ এই আত্মা ও ক্বলবের উপরও প্রাধান্য বিস্তারের বাসনা করে। সে চায় আত্মার আনুগত্য এবং উহার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যেন নিজের ইচ্ছামত উহাকে ব্যবহার করিতে পারে। মানুষের এই চাহিদার মাঝেই রবুবিয়াতের সিফাতের সহিত এক প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। আমরা আগেই বলিয়াছি, মানুষের অন্তর কাহারো প্রতি ভক্তি ও মোহাব্বত ব্যতীত কখনো তাহার অনুগত হয় না। আর মানুষের কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের উপর বিশ্বাস ব্যতীত এই ভক্তি ও মোহাব্বতও পয়দা হয় না। মানুষের যে কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বই সকলের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। কেননা, এই কৃতিত্বের সম্পর্ক খোদায়ী সিফাতের সহিত। আর খোদায়ী সিফাত স্বভাবতই মানুষের নিকট গ্রহণীয় ও প্রিয় হইয়া থাকে। কেননা, ইহা "আমরে রাব্বানী" বা খোদায়ী বিধানের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই খোদায়ী বিধান মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান– যাহা মৃত্যু দ্বারাও বিনাশ হয় না এবং মাটিও যাহাকে নিঃশেষ করিতে পারে না। ইহাই ঈমান ও মা'রেফাতের স্তর যাহা মানুষকে আল্লাহতে পৌঁছাইয়া দেয় এবং আল্লাহর দীদার লাভের উসিলা হয়।

উপরের দীর্ঘ আলোচনার সার কথা হইল, জাহ্ এর অর্থ হইতেছে–

মানুষের অন্তর অনুগত হওয়া। মানুষের আত্মা কাহারো অনুগত হইলে সেই আত্মার উপর তাহার প্রাধান্য ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা রবুবিয়াতেরই একটি সিফাত। এই কারণেই মানব স্বভাব উৎকর্ষ পর্যায়ের এলেম ও ক্ষমতাকে মোহাব্বত করে। জাহ্ ও মাল হইল সেই ক্ষমতার উপকরণ। যেহেতু এলেম-অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার কোন অন্ত নাই; সেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু মানুষের এলেম ও ক্ষমতার বাহিরে থাকে, ততক্ষণ এই বিষয়ে সে নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে করে এবং উহার ফলে তাহার অনুসন্ধিৎসার ও বিরাম হয় না। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেম পিপাসু ও সম্পদ লোভী সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ইহারা কখনো তৃপ্ত হয় না। তো বক্ষমান আলোচনা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হইয়া গেল যে, মানবাত্মার চাহিদা হইল কামাল বা কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। এই কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হাসিল হয় এলেম ও ক্ষমতা দ্বারা।

প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব

উপরের আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে ধারণা পাওয়া গেল যে, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একক ও অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ অসম্ভব হওয়ার পর কেবল এলেম ও ক্ষমতাই এমন দুইটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে, যাহার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব সাফল্য ও কৃতিত্ব হাসিল হইতে পারে, কিন্তু এই দুইটির মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য কাল্পনিক সাফল্যের সহিত বিমিশ্রিত। ইহার ব্যাখ্যা হইল– এলেম কেবল আল্লাহ পাকের নিকটই বিদ্যমান। আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো নিকট পূর্ণাঙ্গ এলেম নাই। উহার কারণ তিনটি–

১. প্রথমতঃ এলেম ও অভিজ্ঞতার আধিক্য ও ব্যাপকতা, কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এলেম ও অভিজ্ঞতা সমস্ত এলেমকে বেষ্টন করিয়া আছে। সুতরাং যেই ব্যক্তির এলেম যত ব্যাপক হইবে সেই ব্যক্তি সেই অনুপাতেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিবে।

২. দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের এলেম হইল প্রকৃত অভিজ্ঞতার এলেম। অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় অভিজ্ঞতার আসল হাকীকত তাঁহার সম্মুখে অতীব সুস্পষ্ট ও প্রতিভাত। সুতরাং যেই ব্যক্তির এলেম যত সুস্পষ্ট, ত্রুটিমুক্ত, বাস্তবানুগ ও সত্য হইবে, সেই অনুপাতেই সে আল্লাহর কুরবত ও নৈকট্য হাসিল করিবে।

৩. তৃতীয় কারণ হইল, আল্লাহ পাকের এলেমের কোন বিনাশ নাই। তিনি অনন্ত কাল যাবৎ এইভাবেই থাকিবেন। তাঁহার এলেমের মধ্যে কোনরূপ হেরফের ও পরিবর্তন কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং বান্দার এলেম যত পাকা ও মজবুত হইবে, আল্লাহ পাকের নৈকট্যও সেই অনুপাতেই হাসিল হইবে।

এলেমের প্রকার ভেদ

এলেম দুই প্রকার– ১. পরিবর্তনযোগ্য এবং ২. অনাদি ও অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তনযোগ্য এলেমের উদাহরণ যেমন– জায়েদ ঘরে থাকার এলেম। অর্থাৎ এক ব্যক্তি মনে করিতেছে, জায়েদ ঘরে আছে। এখন এমনও হইতে পারে যে, জায়েদ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আর সেই ব্যক্তি মনে করিতেছে জায়েদ এখনো ঘরেই আছে। এমতাবস্থায় জায়েদ ঘরে থাকা সংক্রান্ত তাহার এলেম ত্রুটিপূর্ণ হইবে এবং এই বিষয়ে তাহার এলেমকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা হইবে না। আরেক প্রকার এলেম হইল যাহা অলংঘনীয় এবং কখনো পরিবর্তন হইবার নহে। আল্লাহ পাকের জাত সিফাত, তাঁহার যাবতীয় কার্যক্রম, আসমান ও জমিনে তাঁহার হেকমত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের শাশ্বত বিন্যাসের এলেমই হইল উৎকর্ষ পর্যায়ের এলেম ও প্রকৃত সাফল্য। যেই ব্যক্তি এই সাফল্যের অধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তিই আল্লাহ পাকের নৈকট্য হাসিল করিতে সক্ষম হইবে। আত্মার এই কৃতিত্ব ও সাফল্য মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকিবে এবং আরেফগণের জন্য ইহা নূরের মিনারে পরিণত হইবে। এই প্রসঙ্গে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا =

অর্থঃ "তাহাদের নূর তাহাদের সামনে ও ডান দিকে ছুটাছুটি করিবে। তাহারা বলিবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করিয়া দিন।"

(সূরা তাহরীমঃ আয়াত ৮)

অর্থাৎ এই মা'রেফাত এমন এক সম্পদে পরিণত হইবে যে, দুনিয়াতে যেই সমস্ত বিষয় নিগুঢ় রহস্যের অন্তরালে আচ্ছাদিত ছিল এবং যেই সব এলেম সুস্পষ্ট ছিল না, তখন সেইগুলিও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। উহার উদাহরণ এইরূপ– কোন মানুষের নিকট হয়ত একটি অতি সাধারণ প্রদীপ আছে। এখন সে হয়ত এই টিমটিমে প্রদীপের আলো বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবে কিংবা ইহা দ্বারা অন্য কোন প্রদীপ জ্বালাইয়া লইবে। অর্থাৎ তাহার প্রদীপটি যত মন্দই হউক এবং উহার আলো যত স্বল্পই হউক– একটি প্রদীপ যখন তাহার হাতে আছে, উহার সাহায্যেই সে উজ্জ্বল আলো ও ভাল প্রদীপের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কিন্তু যেই ব্যক্তির নিকট কোন প্রদীপই নাই, সেই ব্যক্তি না অন্য কোন প্রদীপ জ্বালাইতে পারিবে, না আলো ও নূর বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করিতে পারিবে। তো আল্লাহর মা'রেফাত হইতে বঞ্চিত ব্যক্তির অবস্থাও সেই প্রদীপহীন ব্যক্তির মত। উহার উদাহরণ এইরূপ–

كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا =

অর্থঃ “সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হইতে পারে, যে অন্ধকারে রহিয়াছে– তথা হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না”? (সূরা আন্‌আম ঃ আয়াত ১২৩)

বরং তাহাদের নূরহীন অন্ধকারের উদাহরণ যেন এইরূপ–

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ =

অর্থঃ “অথবা (তাহাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাহাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যাহার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার।” (সূরা নূরঃ আয়াত ৪০)

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ পাকের মা'রেফাতই হইল যাবতীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্যের জলাধার। কিছু কিছু বিষয়ের এলেম ও মা'রেফাত তো এমন আছে যে, ঐগুলি দ্বারা দুনিয়াতেও কোন ফায়দা হয় না। যেমন কাব্য ও বংশ পরম্পরার এলেম। আবার কতক এলেম ও মা'রেফাতের অবস্থা হইল, ঐ এলেম ও মা'রেফাত দ্বারা আল্লাহর মা'রেফাত হাসিলের ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন আরবী ভাষা, তাফসীর, ফেকাহ ও হাদীসের এলেম। অর্থাৎ আরবী ভাষা জানা থাকিলে তাহা কোরআনের তাফসীর শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। তাফসীর জানা থাকিলে এবাদত ও আমলের বিবরণ সমূহ ভালভাবে উপলব্ধি করা সহজ হয়। এবাদত ও আমলের ফলে আত্মশুদ্ধির পথ সুগম হয়। আত্মশুদ্ধি বা নফসের এসলাহের পর্যায় অতিক্রম করিতে পারিলে হেদায়েত নসীব হয় এবং এই হেদায়েতের ফলে আল্লাহর মা'রেফাত হাসিলের যোগ্যতা পয়দা হয়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

অর্থঃ “যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয়।” (সূরা শামসঃ আয়াত ৯)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ *

অর্থঃ “যাহারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে আমার পথে পরিচালিত করিব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মপরায়নদের সঙ্গে আছেন।” (সূরা আনকাবুতঃ আয়াত ৬৯)

এই সমস্ত এলেম হইল আল্লাহর মা'রেফাত হাসিলের উসিলা স্বরূপ। প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য আল্লাহর মা'রেফাত এবং তাঁহার সিফাত ও কার্যক্রম সমূহের মা'রেফাতের মধ্যে নিহিত। ইহার মধ্যে যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মা'রেফাতও

অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যাবতীয় সৃষ্টবস্তু তো আল্লাহ পাকেরই কর্ম বটে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন দুনিয়ার কোন বস্তুর উপর এই দৃষ্টিকোণ হইতে নজর দিবে যে, ইহা আল্লাহ পাকেরই কর্ম ও তাঁহার কুদরতের নিদর্শন এবং এই বস্তুটির সহিত আল্লাহর ইচ্ছা, শক্তি ও তাঁহার হেকমত জড়িত; তখন এইসবের মাঝেই সে আল্লাহর মা'রেফাতের সন্ধান খুঁজিয়া পাইবে। আর ইহাই হইল উৎকর্ষ পর্যায়ের এলেম।

এতক্ষণ আমরা এলেম প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। এইবার আমরা কুদরত বা ক্ষমতা প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। আসলে কুদরত বা ক্ষমতার ক্ষেত্রে মানুষ প্রকৃত সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে অক্ষম। প্রকৃত ক্ষমতা কেবল আল্লাহ পাকেরই হাতে এবং তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তবে বান্দার ইচ্ছা, শক্তি ও কর্মতৎপরতার ফলে যাহাকিছু সৃষ্টি হয়, উহা আসলে আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেন। এই বিষয়ে আমি “সবর ও শোকর” শীর্ষক কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

সারকথা হইল, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কেবল আল্লাহ পাকেরই হাতে এবং এই ক্ষেত্রে বান্দার অবস্থা নেহায়েতই দুর্বল। তবে বান্দার উৎকর্ষ পর্যায়ের যেই এলেম হাসিল করিবে, তাহা মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকিয়া বান্দাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। অবশ্য মানুষের প্রাপ্ত কুদরত ও ক্ষমতা এলেমেরই উসিলা বটে। এই ক্ষমতার অর্থ– মানুষের অঙ্গ-অবয়ব সুস্থ থাকা। যেমন হাত সুস্থ থাকিলে উহা ধারণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। পা সুস্থ থাকিলে উহা পথ চলার শক্তি পায়। অনুভূতির সুস্থতার ফলে মানুষ উপলব্ধির শক্তি পায়। ইত্যাদি। এইসব শক্তিই মানুষকে এলেমের পূর্ণতার হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। এই শক্তি অর্জনের জন্য জাহ্ ও মালের যগপৎ সাহায্য আবশ্যক হয়। উহার ফলে আহারাদি, লেবাস-পোশাক এবং জীবন ধারণের অপরাপর আবশ্যকীয় উপকরণসমূহ লাভ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই সব জীবনোপকরণ দ্বারা মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপকৃত হইতে পারে। এখন কোন ব্যক্তি যদি এইসব উপকরণসমূহ আল্লাহর মা'রেফাত হাসিলের কাজে ব্যবহার না করে, তবে উহা দ্বারা যেন সে কোনভাবেই উপকৃত হইতে পারিল না। সে হয়ত কিছু দিন উহার স্বাদ ভোগ করিতে পারিবে বটে কিন্তু অচিরেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। এই সাময়িক উপকারকে যাহারা পূর্ণতা ও চূড়ান্ত সাফল্য মনে করিবে, তাহারা প্রকৃত অর্থেই জাহেল ও মূর্খ। অধিকাংশ মানুষই এই জেহালাতের অতল গহবরে নিপতিত হইয়া বরবাদ হইতেছে। তাহারা মনে করে শারীরিক সামর্থ্য, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করার নামই পূর্ণতা ও সাফল্য। এই অলীক ধারণা যখন বিশ্বাসে পরিণত হয় তখন তাহারা উহাকে মোহাব্বত করিতে থাকে এবং উহার

পিছনেই মেহনত শুরু করে। এইভাবেই তাহারা একটি অলীক ও অবাস্তব অবস্থার পিছনে পড়িয়া বরবাদ হয় এবং প্রকৃত সাফল্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহর নৈকট্য হইতে বঞ্চিত হয়। এই প্রকৃত সাফল্যই হইল উৎকর্ষ পর্যায়ের এলেম ও আজাদী। এলেম সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা 'আজাদী' প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

আজাদী বা মুক্তির মর্ম হইল– যাবতীয় কামনা-বাসনা ও পার্থিব বালা-মুসীবতের পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া ফেরেশতাদের মত সেইসবের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করিয়া উহা বশে আনা। অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে যেমন কোনরূপ কামনা-বাসনা ও কাম ক্রোধ ইত্যাদির কোন কিছুই বিভ্রান্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকেও সেই অবস্থায় উন্নীত করা। বস্তুতঃ কাম ও ক্রোধ হইতে নিজকে মুক্ত করার নামই প্রকৃত পূর্ণতা ও সাফল্য এবং ইহাই ফেরেশতাসুলভ বৈশিষ্ট্য। খোদায়ী সিফাতের বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহার উপর কোনরূপ তাগাইউর ও পরিবর্তন আরোপিত করা যায় না এবং কোন বস্তুও তাঁহার উপর কোনরূপ ক্রিয়া করিতে পারে না। সুতরাং যেই ব্যক্তি যাবতীয় উপসর্গের প্রভাব এবং সতত পরিবর্তন ও অস্থিতিশীলতা হইতে যেই পরিমাণ বিমুক্ত থাকিবে, সেই পরিমাণেই সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিবে এবং ফেরেশতাদের সহিত সাদৃশ্যতা অর্জন করিতে পারিবে। ইতিপূর্বে আলোচিত এলেম ও ক্ষমতার পূর্ণতার বাহিরে ইহা এক তৃতীয় সাফল্য ও পূর্ণতা।

কাম-প্রবৃত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা এবং উহার আনুগত্য না করাকে যদি পূর্ণতা বলা হয়, তবে উহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে। ১. কামালে এলম বা এলমী পূর্ণতা। ২. কামালে হুরমত বা কামনা-বাসনা এবং পার্থিব উপসর্গের গোলামী না করা। ৩. কামালে কুদরত বা ক্ষমতার পূর্ণতা। তো বান্দার পক্ষে কামালে এলম ও কামালে হুরমত অর্জন করা সম্ভব বটে কিন্তু কামালে কুদরত বা ক্ষমতার ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করা বান্দার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নহে। কেননা, সাময়িক জীবন শেষে মৃত্যুর পর তাহার কোন ক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এলেম ও হুরমতের ধারা এবং উহার সুফল মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষমতাও নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই ক্ষমতা চাই আর্থিক, শারীরিক বা জনবল সংক্রান্তই হউক। অথচ জাহেল লোকেরা জাহ্ ও মালের পিছনে অবিরাম মেহ্নত করিতেছে এবং উহার মাধ্যমে কামালে কুদরত বা ক্ষমতার পূর্ণতা অর্জন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু তাহারা কোন দিনই এইরূপ ক্ষমতার নাগাল পাইবে না এবং ইহা কোন দিন স্থায়ীও হইবে না। অথচ তাহারা যেই এলেম ও হুরমতকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে এই এলেম ও হুরমতই হইতে পারিত তাহাদের স্থায়ী সম্পদ এবং মৃত্যুর পরও উহা তাহাদের সঙ্গে অব্যাহত

থাকিত। ইহারা যেন নিম্নোক্ত আয়াতেরই প্রতিচ্ছবি–

أُولٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ =

অর্থঃ "ইহারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করিয়াছে। অতএব, ইহাদের শাস্তি লঘু হইবে না এবং ইহারা সাহায্যও পাইবে না।"

(সূরা বাকারাঃ আয়াত ৮৬)

এই শ্রেণীর লোকেরা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করে নাই–

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا =

অর্থঃ "ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার নিকট প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম।" (সূরা কাহ্ফঃ আয়াত ৪৬)

বস্তুতঃ এলেম ও হুরমতই হইল "বাক্বিয়াতুস্ সালিহাত" বা স্থায়ী সৎকর্ম যাহা মানবাত্মায় স্থায়ী হয়। আর জাহ্ ও মাল হইল এমন দ্রুত বিলিয়মান বস্তু যাহা মানুষের কোন কল্যাণ করিতে পারে না। নিম্নোক্ত আয়াতে উহার যথার্থ উদাহরণ বিবৃত হইয়াছে–

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ، حَتّٰى اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا، اَتٰهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ، كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ *

অর্থঃ "পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিলাম, পরে তাহা মিলিত-সংমিশ্রিত হইয়া তাহা হইতে জমিনের শ্যামল উদ্ভিদ বাহির হইয়া আসিল যাহা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খাইয়া থাকে। এমনকি জমিন যখন সৌন্দর্য-সুষমায় ভরিয়া উঠিল আর জমিনের অধিকর্তাগণ ভাবিতে লাগিল, এইগুলি আমাদের হাতে আসিবে, হঠাৎ করিয়া তাহার উপর আমার নির্দেশ আসিল রাতে কিংবা দিনে, তখন সেইগুলিকে কাটিয়া স্তূপাকার করিয়া দিল যেন কালও এখানে কোন আবাদ ছিল না, এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করিয়া থাকি নিদর্শনসমূহ সেই সমস্ত লোকদের জন্য যাহারা

লক্ষ্য করে।” (সূরা ইউনুসঃ আয়াত ২৪) অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ
الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

অর্থঃ “তাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তাহা পানির ন্যায়, যাহা আমি আকাশ হইতে নাজিল করি। অতঃপর ইহার সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতাপাতা নির্গত হয়, অতঃপর তাহা এমন শুষ্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়িয়া যায়। আল্লাহ পাক এই সবকিছুর উপর শক্তিমান।” (সূরা কাহ্ফঃ আয়াত ৪৫)

যেই সকল বস্তু মৃতুর মাধ্যমে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, উহাই ভোগের সামগ্রী। আর মৃত্যুর পরও যাহা মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, উহা হইল ‘বাক্বিয়াতুস্ সালিহাত’ বা স্থায়ী সৎ কর্ম। এই আলোচনা দ্বারা এই বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, জাহ্ ও মাল দ্বারা উপার্জিত ক্ষমতাকে পূর্ণতা ও সাফল্য মনে করা একেবারেই অর্থহীন। যেই ব্যক্তি উহাকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক উহার পিছনে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, সে যথার্থই জাহেল।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে সেই সকল ব্যক্তিদের কথা আলাদা, যাহারা জাহ্ ও মালকে কেবল প্রয়োজন পরিমাণ ব্যবহার করিয়াছে এবং প্রকৃত সাফল্যের পথে ঐগুলিকে একটা অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। আয় আল্লাহ! আপনি নিজ ফজল ও করমে আমাদিগকে খায়ের ও হেদায়েত দান করুন। আমীন!

জাহ্ প্রিয়তার মন্দ দিক ও ভাল দিক

ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, জাহ্ শব্দের অর্থ হইতেছে, মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া বা নিজের কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব দ্বারা মানুষের অন্তরকে জয় করিয়া লওয়া। সুতরাং এই জাহ্ এর হুকুমও ধন-সম্পদের হুকুমের মতই হইবে। কেননা, মাল বা সম্পদ দ্বারা যেমন পার্থিব উদ্দেশ্য সমূহ পূরণ করা হয়, তদ্রূপ জাহ্ দ্বারাও পার্থিব চাহিদা মিটানো হয় এবং মালের মত ইহাও মৃত্যুর মাধ্যমে নিঃশেষ হইয়া যায়।

দুনিয়া হইল আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং দুনিয়াতে উৎপন্ন বস্তু হইতেই আখেরাতের পাথেয় গ্রহণ করিতে হইবে। দুনিয়াতে খানাপিনা ও লেবাস-পোশাকের জন্য যেমন মাল বা অর্থের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সমাজে ইজ্জতের সহিত বসবাসের জন্যও কিছু জাহ বা সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মানের প্রয়োজন হয়।

জীবন ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণ একটি অপরিহার্য কর্ম। এই কারণে মানুষ

খাদ্যকে মোহাব্বত করে বা যেই অর্থ দ্বারা খাদ্য ক্রয় করা হয় উহাকে মোহাব্বত করে। তো জীবনে চলার পথে অপরাপর মানুষের সাহায্যও দরকার হয়। যেমন খেদমতের জন্য একজন খাদেম, সাহায্যের জন্য একজন বন্ধু, পথপ্রদর্শনের জন্য একজন উস্তাদ এবং নিরাপত্তার জন্য একজন শাসক– ইত্যাদি। এখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি এইরূপ কামনা করে যে, খাদেমের মনে তাহার প্রতি কিছুটা ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকুক যেন সে মন দিয়া সেবা করে, বন্ধুর মনে তাহার প্রতি মোহাব্বত ও ভালবাসা থাকুক যেন সে প্রয়োজনের সময় আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে, তবে ইহাকে খারাপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। অনুরূপভাবে উস্তাদের মনে শিষ্যের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবোধ বিদ্যমান থাকা যেন তিনি উত্তমরূপে তা'লীম-তরবিয়ত করেন বা দুষ্ট লোকের অনিষ্ট হইতে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে শাসকের অন্তরে কিছুটা স্থান করিয়া লওয়া– ইত্যাদি বিষয়গুলিও ক্ষতিকারক নহে। এই আলোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে, জাহ্ ও মাল হইল পার্থিব উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম এবং এই হিসাবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

তবে এই ক্ষেত্রে যেই অবস্থাটি একান্তই বাস্তব তাহা হইল, জাহ্ ও মাল তথা যশ-খ্যাতি ও ধন-সম্পদ সরাসরি কাম্য হওয়া উচিৎ নহে। বরং উহাকে মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ– এক ব্যক্তি মল ত্যাগের উদ্দেশ্যে ঘরে একটি শৌচাগার নির্মাণ করা উত্তম মনে করিতেছে। তাহার মনোভাব হইল, যদি মল ত্যাগের প্রয়োজন না হয়, তবে ঘরে শৌচাগার রাখিবে না। এমতাবস্থায় তাহার সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করা যাইবে না যে, লোকটি শৌচাগারকে মোহাব্বত করে। বরং লোকটির প্রকৃত অবস্থা হইল– মল ত্যাগ করা তাহার মূল লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হিসাবেই সে শৌচাগার নির্মাণ উত্তম মনে করিয়াছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তাহার প্রার্থিত ও প্রিয় বস্তুর মাধ্যমকে মোহাব্বত করিলেই এমন মনে করা যাইবে না যে, সে ঐ মাধ্যমকে মোহাব্বত করিতেছে। বরং তাহার প্রিয় বস্তুর মাধ্যম হওয়ার কারণেই সে উহাকে মোহাব্বত করিতেছে– যাহা প্রকারান্তরে সেই প্রিয় বস্তুর মোহাব্বতই বটে। নিম্নের উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি আরো ভালভাবে উপলব্ধি করা যাইবে–

মনে কর, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এই কারণে মোহাব্বত করে যে, কাম-উত্তেজনার সময় সে তাহার খাহেশ পূরণ করিয়া দেয়– যেমন শৌচাগার মল ত্যাগের চাহিদা পূরণ করে। এই ব্যক্তির যদি যৌন উত্তেজনা না থাকিত, তবে সে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিত। যেমন পায়খানার হাজত না হইলে সে ঘরে শৌচাগার রাখিত না। অর্থাৎ স্ত্রীকে মোহাব্বত করে কাম-চাহিদার জন্য এবং শৌচাগারকে মোহাব্বত করে মল ত্যাগের জন্য। আবার কতক

লোক এমনও আছে যাহারা স্ত্রীর রূপ-লাবণ্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাহার জন্য এমনভাবে পাগলপরা হইয়া থাকে যে, কাম-চাহিদা না থাকিলেও কখনো তাহারা স্ত্রীকে তালাক দেয় না। তো স্ত্রীর জন্য এই দ্বিতীয় প্রকারের মোহাব্বতই হইল প্রকৃত মোহাব্বত– প্রথম প্রকারের মোহাব্বতকে প্রকৃত মোহাব্বত বলা যাইবে না। জাহ্ ও মাল তথা যশ-খ্যাতি ও ধন সম্পদের অবস্থা ও তদ্রূপ। ঐগুলিকেও অনুরূপ দুই অবস্থায় মোহাব্বত করা হয়। সেমতে জাহ্ ও মালকে যদি দৈহিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম হিসাবে মোহাব্বত করা হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় নহে। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যমে হউক বা না হউক– এমনিই যদি ঐ গুলিকে মোহাব্বত করা হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় নহে। তবে জাহ্ ও মাল যদি কোনরূপ গোনাহের কাজে ব্যবহার করা না হয় এবং উহা অর্জনের ক্ষেত্রে যদি মিথ্যা-প্রতারণা ও হারাম উপায় অবলম্বন করা না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফাসেক বলা যাইবে না। জাহ্ ও মাল অর্জনের জন্য কোন এবাদতকেও মাধ্যম বানানো যাইবে না। কেননা, এবাদতের মাধ্যমে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা একটি ধর্মীয় অপরাধ এবং ইহা সুস্পষ্টরূপেই হারাম।

প্রসঙ্গঃ মানুষের অন্তরে আসন স্থাপন

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, খাদেম, বন্ধু, উস্তাদ ও শাসকের অন্তরে আসন স্থাপনের কোন নির্দিষ্ট সীমা আছে কি-না? এই প্রশ্নের জবাব হইল– তাহাদের অন্তরে তিন উপায়ে আসন স্থাপিত হইতে পারে। উহার মধ্যে দুইটি উপায় বৈধ এবং একটি উপায় অবৈধ। অবৈধ উপায় হইল– অপরকে এমন গুণের ভক্ত করা যাহা নিজের মধ্যে বর্তমান নহে। যেমন তাহাকে বলা যে, আমি আলেম-পরহেজগার কিংবা সৈয়্যদ বংশের লোক ইত্যাদি। এই দাবী মিথ্যা ও প্রতারণা হওয়ার কারণে ইহা অবৈধ ও হারাম।

বৈধ দুইটি উপায়ের একটি হইল– নিজের মধ্যে যেই গুণ ও যোগ্যতা আছে উহা প্রকাশ করিয়া উহার উপযোগী মর্যাদা প্রার্থনা করা। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিসরের শাসনকর্তাকে বলিয়াছিলেন–

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَاۤئِنِ الْاَرْضِ، اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ -

অর্থঃ "ইউসুফ বলিলঃ আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।" (সূরা ইউসুফঃ আয়াত ৫৫)

এখানে তিনি নিজেকে উত্তম রক্ষক ও বিজ্ঞ হিসাবে জাহির করিয়া শাসনকর্তার অন্তরে আসন স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন– যাহা বাস্তবেও তাহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

আরেকটি উপায় হইল, নিজের কোন অপরাধ ও দোষ ত্রুটি গোপন রাখা যেন অপরের দৃষ্টিতে হেয় হইতে না হয়। ইহা মোবাহ ও জায়েয। কেননা, পাপকর্ম গোপন রাখা জায়েজ এবং উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা না জায়েয। অপরাধ ও গোনাহ গোপন করার মধ্যে কোন প্রতারণা নাই। তাছাড়া এই পদ্ধতিটি এমন সব বিষয় অবগত হওয়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দেয় যাহা জানার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। যেমন এক ব্যক্তি বাদশাহর নিকট হইতে নিজের মদ পানের কথা গোপন করিতেছে। কিন্তু নিজের এই ত্রুটি গোপন করা দ্বারা তাহার মনে এমন বিশ্বাস পয়দা হইতেছে না যে, আমি একজন মোত্তাকী ও পরহেজগার। অর্থাৎ সে যদি এইরূপে বলিত যে, আমি মদ্যপ নহি এবং আমি একজন ধার্মিক, তবে এই দাবীতে সে মিথ্যাবাদী হইত। মদ পানের কথা স্বীকার না করা– তাকওয়ার বিশ্বাস সৃষ্টি করে না। ইহা দ্বারা বড়জোর এতটুকু করা হয় যে, মদ পান করার কথা অপরের নিকট হইতে গোপন করা হয়।

মানুষের অন্তরে ভক্তি পয়দা করার জন্য উত্তমরূপে নামাজ পড়া ইহাও অবৈধ উপায়ের মধ্যে গণ্য। কেননা, ইহা সুস্পষ্টরূপেই রিয়া। আর লোকদেখানো রিয়া প্রকৃত অর্থেই প্রতারণা। কারণ, যেই ব্যক্তি তাহার এই উত্তম নামাজ অবলোকন করে, সে মনে করে, এই ব্যক্তি নেহায়েত এখলাস ও খুশু-খুজুর সহিত নামাজ পড়িতেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে করিতেছে রিয়া। এখলাস ও খুশু-খুজুর সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। এইভাবে জাহ্ ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করা হারাম। এই উদাহরণটির উপর অপরাপর গোনাহসমূহ কেয়াস করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করা যেমন হারাম, তদ্রূপ অবৈধ উপায়ে জাহ্ ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করাও হারাম। কাহারো সঙ্গে প্রতারণা করিয়া তাহার সম্পদ দখল করা যেমন জায়েয নহে, তদ্রূপ প্রতারণার মাধ্যমে কাহারো অন্তরে আসন স্থাপন করাও জায়েয নহে। কাহারো অন্তরের মালিক হওয়া, সম্পদের মালিক হওয়া অপেক্ষা গুরুতর।

প্রশংসায় আনন্দ ও নিন্দায় অসন্তুষ্ট হওয়া

প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার কারণ

মানুষ যেই সকল কারণে অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত হয়, সেই কারণগুলি চারি প্রকার–

প্রথম কারণ

অপরের মুখে প্রশংসা শুনিয়া প্রফুল্ল হওয়ার প্রথম কারণটিই সর্বাধিক প্রবল ও শক্তিশালী। সেই কারণটি হইল, অপরের মুখে প্রশংসা শুনিয়া মন জানিতে

পারে যে, সে বিশেষ কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অধিকারী। ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি, কোন বিষয়ে পূর্ণতা ও যোগ্যতা অর্জন স্বভাবতই মানুষের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে এবং যে কোন যোগ্যতা ও পূর্ণতা হাসিল হইলেই মানুষ এক প্রকার আত্মসুখ অনুভব করে। সুতরাং মন যখন নিজের কোন কামাল ও যোগ্যতার কথা জানিতে পারে তখন সে কিযে আনন্দ অনুভব করে তাহা বলিয়া বুঝাইবার মত নহে।

মানুষ নিজের যোগ্যতার কথা তখনই জানিতে পারে যখন অপরের মুখে নিজের প্রশংসার কথা শুনিতে পায়। যেই গুণটির কথা উল্লেখ করিয়া তাহার প্রশংসা করা হয়, সেই গুণটি অনেক সময় এমনও হয় যাহা প্রকাশ্য ও সর্বজন বিদিত। আবার অনেক সময় সেই গুণটি নিজের নিকট সন্দেহযুক্তও হয়। তো নিজের কোন প্রকাশ্য গুণের কথা শুনিলে আনন্দ কিছুটা কম হয়। যেমন কাহারো সম্পর্কে হয়ত বলা হইল, তুমি বেশ লম্বা এবং তোমার গায়ের রংও ফর্সা। এখন তাহার এই গুণটি যদিও প্রকাশ্য ও সর্বজন বিদিত এবং সেই ব্যক্তি নিজেও তাহার ঐ গুণ সম্পর্কে অবগত, কিন্তু ঐ গুণের কথা সকল সময় মনে হাজির থাকে না। যখন সেই গুণের কথা জানিতে পারে বা স্মরণে আসে, তখন আনন্দ অনুভূত হয়।

পক্ষান্তরে নিজের কোন সন্দেহযুক্ত গুণ সম্পর্কে যদি অপর কেহ প্রশংসা করে, তবে উহার ফলে সে এমন এক আত্মিক সুখ ও পুলক অনুভব করে যে, উহার সঙ্গে অপর কোন আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। উদাহরণতঃ কাহারো প্রশংসা করিয়া হয়ত বলা হইল– তুমি একজন বড় আলেম ও পরহেজগার এবং তোমার দৈহিক রূপেরও কোন অন্ত নাই– ইত্যাদি। তো মানুষ নিজের এলেম ও পরহেজগারী সম্পর্কে সর্বদা একটা সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে এবং সে ইহা কামনা করে যেন কোন উপায়ে তাহার এই সন্দেহ দূর হইয়া নিজের গুণটি নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে সে ইহাও কামনা করে যেন অপর কেহ তাহার এই গুণের মোকাবেলা করিতে না পারে। যখন অপর কোন ব্যক্তি তাহার সেই গুণ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তাহার প্রশংসা করে, তখন সেই গুণ সম্পর্কে মনে এতমিনান ও এক্বীন পয়দা হয় যে, যথার্থই আমি সেই গুণের অধিকারী। অর্থাৎ এইভাবেই তাহার মনে এক অনাবিল আত্মসুখ অনুভব হয়। বিশেষতঃ যখন কোন জ্ঞানী-গুণী, আলেম, পরহেজগার ও দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তির মুখে এই প্রশংসা শোনা হয় কিংবা এমন ব্যক্তির মুখে যিনি সত্যাসত্য যাচাই না করিয়া নিজের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির করেন না– তখন এই আনন্দ আরো অধিক মাত্রায় অনুভূত হয়। উদাহরণ স্বরূপ– কোন উস্তাদ যদি তাহার কোন ছাত্রের জেহেন ও মেধার প্রশংসা করে, তবে সেই ছাত্রের আনন্দের কোন সীমা থাকে না। অথচ এই প্রশংসাই যদি

এমন কোন ব্যক্তির মুখ হইতে শোনা হয় যেই ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করিয়া কথা বলিতে অভ্যস্থ নহে এবং মানুষের জেহেন ও মেধা সম্পর্কে যার কোন ধারণা নাই– তবে এই ক্ষেত্রে এতটা আনন্দ অনুভব হয় না।

অপরের মুখে নিজের নিন্দা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণও ইহাই যে, অপরের মুখে নিন্দা শুনিয়া নিজের অপরাধের কথা জানা হয় এবং এই জানার কারণে নিজের মনে কষ্ট অনুভব করে। আর এই নিন্দা যখন কোন জ্ঞানী-গুণী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মুখে শোনা হয়, তখন কষ্টের মাত্রাও অধিক হয়।

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় কারণ হইল, কোন মানুষ যখন কাহারো প্রশংসা করে তখন ইহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয় যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি প্রশংসিত ব্যক্তির ভক্ত-অনুরক্ত এবং তাহার অন্তরও সেই ব্যক্তির মালিকানাধীন। কাহারো অন্তরের মালিকানা লাভ করা ইহা সকলের নিকটই প্রিয় ও পছন্দনীয়। কেননা, যখন সে ইহা জানিতে পারিবে যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি তাহার একান্ত অনুগত এবং সে যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবেই তাহাকে ব্যবহার করিতে পারিবে, তখন নিশ্চিতরূপেই সে আনন্দিত হইবে। বিশেষতঃ প্রশংসাকারী ব্যক্তি যদি বিশেষ ক্ষমতাবান হয় যেমন– কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি, বিচারক বা দেশের শাসক– তবে আনন্দ আরো বেশী হইবে। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহাদের দ্বারা অধিক লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা করা হইবে।

পক্ষান্তরে প্রশংসাকারী ব্যক্তি যদি সমাজের কোন নগণ্য ও হীন ব্যক্তি হয়, যার কথার কোন মূল্য নাই এবং যেই ব্যক্তি অপর কাহাকেও সাহায্য করিবার কোন ক্ষমতা রাখে না, তবে সেই ক্ষেত্রে আনন্দের মাত্রাও অতি নগণ্য হইবে। কেননা, এইরূপ ব্যক্তির আনুগত্য একেবারেই মূল্যহীন এবং তাহার পক্ষ হইতে কোন ভাবেই উপকৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। অনুরূপভাবে নিন্দা অপছন্দনীয় হওয়া এবং উহা দ্বারা অন্তর ব্যথিত হওয়ার কারণও ইহাই যে, নিন্দাকারী ব্যক্তির অন্তর আমার মালিকানাধীন নহে এবং সে আমার ভক্ত-অনুরক্ত বা আমার ইচ্ছার অনুগামী নহে। আর এই ক্ষেত্রে নিন্দাকারী ব্যক্তি যেই পরিমাণ ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাহীন হইবে, সেই অনুপাতেই তাহার নিন্দার কারণে কষ্ট কম বা বেশী হইবে।

তৃতীয় কারণ

কোন ব্যক্তি অপর কাহারো প্রশংসা করিলে উহার ফলে কেবল তাহার অন্তরই প্রশংসিত ব্যক্তির অনুগত হয় না; বরং এমন হওয়াও সম্ভব যে, এই প্রশংসা শুনিয়া অপরাপর লোকেরাও প্রশংসিত ব্যক্তির অনুগত ও ভক্ত হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ প্রশংসাকারী লোকটি যদি এমন কোন মান্যবর ব্যক্তি হয়

যার কথা লোকেরা গুরুত্ব দেয়, তবে এই ক্ষেত্রে তাহার কথায় অধিক তাছীর হইবে। তবে এই জন্য শর্ত হইল, প্রশংসা জনসম্মুখে হইতে হইবে। সমাবেশ যত বড় হইবে এবং প্রশংসাকারী ব্যক্তি যত মান্যবর হইবে আনন্দও সেই পরিমাণে বেশী হইবে। উহার বিপরীতে যদি নিন্দা করা হয়, তবে সেই অনুপাতেই কষ্ট অনুভব হইবে।

চতুর্থ কারণ

প্রশংসা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, প্রশংসিত ব্যক্তি একজন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণেই তাহার প্রশংসা করা হয়। এই প্রশংসা চাই স্বেচ্ছায় করা হউক বা তাহার ভয় ও প্রভাবের কারণেই করা হউক। যদি ভয়ের কারণে করা হয় তবে সেই ক্ষেত্রেও তাহার শক্তিমত্তা ও প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। স্বেচ্ছায় প্রশংসা করিলে যেমন আনন্দ অনুভব হয়, তদ্রূপ ভয়ের কারণে প্রশংসা করা হইলেও অন্তরে আনন্দ অনুভব হয়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের দীনতা-হীনতা ও ভীতিভাব এবং উহার বিপরীতে নিজের শক্তিমত্তা ও প্রাধান্যের কল্পনায় পুলক অনুভব করে। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষ যত দুর্বল হইবে সেই অনুপাতেই সে আনন্দ অনুভব করিবে।

উপরে বর্ণিত প্রশংসার চারিটি কারণ যদি একই ব্যক্তির মধ্যে একই সময় পাওয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের আনন্দ অনুভব হইবে। আর প্রশংসার এইসব উপকরণ যেই হারে কম হইবে আনন্দও সেই হারে কম হইবে।

বর্ণিত কারণ সমূহের চিকিৎসা

প্রথম কারণটির চিকিৎসা এইভাবে হইতে পারে যে, প্রশংসিত ব্যক্তি এই বাস্তবতাকে বিশ্বাস করিবে যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি যাহা বলিতেছে তাহা সত্য নহে। যেমন সেই ব্যক্তি এইরূপ বলিল– আপনি একজন উচ্চ বংশের লোক, আপনি আলেম, দানশীল এবং আপনি যাবতীয় মন্দ কর্ম হইতে পবিত্র– ইত্যাদি। অথচ যাহার প্রশংসা করা হইল সেই ব্যক্তি ইহা ভাল করিয়াই জানে যে, আসলে আমি এইরূপ নহি। বরং উহার বিপরীত অবস্থাই আমার মধ্যে বিদ্যমান। মনে মনে এইরূপ চিন্তা আসার পর যোগ্যতা ও পূর্ণতার অনুভূতির কারণে মনে যেই আনন্দ অনুভূত হয় তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর কেবল এমন আনন্দ অবশিষ্ট থাকিবে যাহা প্রভাব ও ক্ষমতার কারণে মানুষের অন্তর ও জবান হইতে অর্জিত হয়। এই পর্যায়ে প্রশংসিত ব্যক্তি যদি মনে করে– প্রশংসাকারী ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, মনে প্রাণে কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস করে না এবং আমি নিজেও তাহার বর্ণিত গুণাগুণ হইতে বঞ্চিত– তবে এই দ্বিতীয়

আনন্দও (ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে কাহারো অন্তর প্রভাবিত হইয়া তাহার পক্ষ হইতে প্রশংসা প্রাপ্তির পর যেই আনন্দ অর্জিত হয় তাহাও) নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অবশেষে কেবল একটি আনন্দ অবশিষ্ট থাকিবে যাহা মানুষের মুখ প্রভাবিত হওয়ার কারণে অর্জিত হয়। অর্থাৎ এই অনুভূতির আনন্দ অবশিষ্ট থাকিবে যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি আমার ভয়ে মুখে মুখে আমার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইতেছে। পক্ষান্তরে এই প্রশংসা যদি সুবিবেচনার সহিত করা না হয়, অর্থাৎ নিছক তামাশা করিয়া করা হয়; তবে বর্ণিত সমস্ত আনন্দই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কেননা, এই ক্ষেত্রে আনন্দ প্রাপ্তির উপাদানের একটিও আর অবশিষ্ট রহিল না।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, প্রশংসা দ্বারা অন্তরে আনন্দ এবং নিন্দা দ্বারা দুঃখ অনুভব হয় কেন আমরা এই কারণে প্রসঙ্গটির অবতারণা করিলাম যেন প্রশংসার মোহাব্বত এবং নিন্দার কারণে দুঃখানুভবের চিকিৎসা জানা যায়। কারণ, যতক্ষণ কোন রোগের কারণ জানা না যাইবে, ততক্ষণ উহার সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভব নহে। রোগের কারণ দূর করাই হইল চিকিৎসার মূল কথা।

যশপ্রীতির চিকিৎসা

যেই ব্যক্তি অন্তরে প্রবল ভাবে "হোব্বে জাহ্" পোষণ করে এবং যশ-খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট, সেই ব্যক্তি অনুক্ষণ মানুষের সুদৃষ্টি অর্জনের জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা চালাইতে থাকে। সকল কথায় ও কাজে তাহার লক্ষ্য থাকে যেন মানুষের মাঝে তাহার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাইয়া সকলের অন্তরে তাহার তাজীম ও সম্মান বদ্ধমূল হয়। বস্তুতঃ মানুষের এই কর্মটিই সকল অনিষ্টের মূল। উহার ফলে এবাদতে আলস্য পয়দা হয় এবং ক্ষেত্রে বিশেষে মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করার জন্য হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

حب الشرف و المال ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل

অর্থঃ "গৌরব ও ধন-সম্পদের মোহ নিফাক উৎপন্ন করে, যেমন পানি শাক-সব্জি উৎপন্ন করে।"

নেফাক অর্থ কপটতা বা মানুষের ভিতর-বাহির এবং কথা ও কাজের বৈপরীত্য। সুতরাং যেই ব্যক্তি মানুষের নিকট সুখ্যাত ও সম্মানের পাত্র হইতে আগ্রহী হয়, সেই ব্যক্তি সকলের সঙ্গে মোনাফেকী আচরণ করিতে বাধ্য হয়। কৃত্রিম সে মানুষের সঙ্গে এমন সব আচরণ করিবে যাহা বাস্তবে তাহার স্বভাবে

অনুপস্থিত। ইহা নির্ভেজাল মোনাফেকী ছাড়া আর কিছুই নহে। হোব্বে জাহ্ তথা যশপ্রীতি মানবাত্মার এক সর্বনাশ ব্যাধি। সুতরাং এই ধ্বংসাত্মক ব্যাধির চিকিৎসা হওয়া জরুরী। এই ব্যাধিটিও ধন-সম্পদের মোহাব্বতের মত এক মজ্জাগত ব্যাধি। উহার চিকিৎসা এলমী ও আমলী– এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত। নিম্নে আমরা পৃথক শীরোনামে উহার বিবরণ পেশ করিব।

যশপ্রীতির এলমী চিকিৎসা

হোব্বে জাহ্ তথা যশপ্রীতির এলমী চিকিৎসা হইল, প্রথমেই সেই কারণটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহা মানুষকে যশপ্রীতি ও সুনাম-সুখ্যাতির প্রতি আকৃষ্ট করে। বলাবাহুল্য সেই কারণটি হইল মানুষের দেহ ও মনের উপর ক্ষমতা অর্জন করা। ইতি পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষ যদি এই ক্ষমতা অর্জন করিতে সক্ষম হয়ও, তথাপি উহার শেষ পরিণতি হইল মৃত্যু। মৃত্যুর মাধ্যমে এই ক্ষমতার চির অবসান ঘটে। ইহা "বাক্বিয়াতুস্ সালিহাত" বা স্থায়ী কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে যে, মৃত্যুর পরও উহার কার্যকারীতা অব্যাহত থাকিবে। মনে কর, ভূপৃষ্ঠের সকল মানুষ যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া সেজদায় লুটাইয়া পড়ে এবং ক্রমাগত পঞ্চাশ বৎসর তাহারা মস্তক উত্তোলন না করে; তবুও না সেজদাহকারীগণ জীবিত থাকিবে, না তুমি চির অমর হইবে। একবার ভাবিয়া দেখ, এই পৃথিবীতে এমন বহু রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন যাহাদের সংখ্যার কোন সীমা-পরিসীমা নাই। যাহাদের খ্যাতি ছিল দুনিয়া জোড়া, তাহাদের সংখ্যাও নিরূপন করিবার মত নহে। কিন্তু বর্তমানে তাহাদের সকল কিছু মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। একদিন তোমাকেও অনুরূপ পরিণতির শিকার হইতে হইবে। সুতরাং তুচ্ছ দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া দ্বীনের মত অমূল্য সম্পদ বর্জন করা বুদ্ধি মানের কাজ নহে। পারলৌকিক জীবনই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। সেই জীবনের সাফল্যই পরম সাফল্য। এমন জীবন, যেই জীবনের সূচনা আছে– শেষ নাই। সেই সুখময় জীবনে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে আর কখনো তোমাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। যেই ব্যক্তি প্রকৃত সাফল্য ও কাল্পনিক সাফল্যের হাকীকত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তির নিকট দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সুনাম-সুখ্যাতির কিছুমাত্র মূল্য নাই। সেই ব্যক্তি বরং সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

একদা হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ)-কে লিখিলেনঃ "মানুষের এমন মনে করা উচিৎ যেন আমার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে।" এই কথার জবাবে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) লিখিলেনঃ "আমাদের তো এমন মনে করা উচিৎ যেন দুনিয়াতে আমাদের আগমনই হয় নাই; আমরা যেন পরকালেই অবস্থান করিতেছি।"

অর্থাৎ তাঁহাদের মন-মানস ও চিন্তা-চেতনার সকল কিছু জুড়িয়া যেন পরকালই বিরাজমান ছিল। এই কারণেই তাঁহাদের আমল ছিল পরিপূর্ণ তাকওয়ার স্তরে। কারণ, তাঁহারা এই কথা ভাল করিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পারলৌকিক সাফল্য মোত্তাকীগণের জন্যই সংরক্ষিত। সুতরাং পার্থিব ধন-সম্পদ ও সুনাম-সুখ্যাতি তাঁহাদের নিকট ছিল একেবারেই মূল্যহীন ও তুচ্ছ বস্তু।

দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টি যেহেতু স্থুল, এই কারণে তাহারা কেবল দুনিয়ার আকর্ষণেই মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাদের স্থুল দৃষ্টি শেষ পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى =

অর্থঃ "বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।" (সূরা আল আ'লাঃ আয়াত ১৬, ১৭)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ =

অর্থঃ "কখনো না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস, এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।" (সূরা কেয়ামাহঃ আয়াত ২০,২১)

মোটকথা, যেই ব্যক্তি এইরূপ জাহ্প্রীতি ও দুনিয়ার সুনাম-সুখ্যাতির প্রতারণায় আক্রান্ত, তাহার পক্ষে নিজ আত্মার সংশোধন করা আবশ্যক। অর্থাৎ তাহার কর্তব্য, এই ব্যাধির ফলে সৃষ্ট বিপদাপদ হইতে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করা। দুনিয়ার নিয়ম হইল– যে কোন নামীদামী ও সম্মানী মানুষের যদি কিছু হিতাকাঙ্খী ও বন্ধু-বান্ধব থাকে, তবে তাহার কিছু শত্রুও অবশ্য থাকিবে। এই শত্রুগণ যে কোন উপায়ে তাহার ক্ষতি সাধনের উপায় খুঁজিতে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই তাহার অনিষ্ট সাধনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাছাড়া সেই নামীদামী লোকগণ নিজেরাও অনুক্ষণ এমন আশংকায় লিপ্ত থাকে যে, আমি যেই সম্মানজনক অবস্থানে আছি, কোন কারণে যেন তাহা লুপ্ত হইয়া না যায় এবং আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ যেন কোন কারণেই আমার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া না পড়ে। মানুষের অন্তরের কোন স্থিতি নাই। আস্থা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ফুটন্ত পানির বুদ্বুদের মতই উহা আবর্তিত হইতে থাকে। মানুষের মনের ভক্তি-শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করিয়া সৌভাগ্যের সৌধ নির্মাণ করা যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালার উপর প্রাসাদ নির্মাণ করারই নামান্তর। সুতরাং নিজের যশ-খ্যাতি ও সম্মান সংরক্ষণের চিন্তা, হিংসুক ও শত্রুর অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষা– ইত্যাদি বিপদাপদের কারণে যশ-খ্যাতির আনন্দ সর্বদাই বিস্বাদে পর্যবসিত থাকে।

অর্থাৎ যশ-খ্যাতির বিনিময়ে মানুষ এই দুনিয়াতে যেই পরিমাণ শান্তির আশা করে, পরিণামে বরং তদাপেক্ষা অধিক বিপদাশংকাতেই তাহাকে লিপ্ত থাকিতে হয়। তদুপরি পার্থিব জীবনের এই যশ-খ্যাতি প্রীতির কারণে পরকালে যেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, উহা তো আছেই। পার্থিব জীবনে এই সব মুসীবতের কারনে খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ অনেক সময় অখ্যাত জীবনের সুযোগ খুঁজিয়া থাকেন। আসলে যশ-খ্যাতি একটি নির্ভেজাল আপদ ও বোকামী ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকদের দৃষ্টিভঙ্গির এলাজ ও চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। কেননা, সতেজ ঈমান ও সুস্থ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনো নিজের আখেরাত বরবাদ করিয়া দুনিয়ার দিকে নজর দিতে পারেন না।

যশপ্রীতির আমলী চিকিৎসা

যশপ্রীতির আমলী এলাজ ও কর্মগত চিকিৎসা হইল, মানুষের অন্তর হইতে নিজের যশ-খ্যাতি মুছিয়া ফেলার জন্য এমন কাজ করা যেন উহার ফলে মানুষের নজরে তিরস্কারের পাত্রে পরিণত হইতে হয় এবং কোন মানুষের অন্তরেই যেন তাহার প্রতি সম্মানের লেশমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। মানুষের নিকট অখ্যাত থাকার চেষ্টা করা এবং শুধু মাত্র আল্লাহ পাকের নিকট মকবুল হওয়াতেই তুষ্ট থাকা। ইহা হইল "তিরস্কার পছন্দ" সম্প্রদায়ের অনুসৃত পদ্ধতি। এই শ্রেণীর লোকেরা স্বেচ্ছায় পাপ কার্যে লিপ্ত হয় যেন উহার ফলে মানুষ তাহাদিগকে অসম্মান করিতে শুরু করে এবং পরিণতিতে তাহারা যশ-খ্যাতির বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করে। অবশ্য যাহারা নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, তাহাদের পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয নহে। কেননা, উহার ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আমলে শৈথিল্য দেখা দেওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে যাহারা অনুসরণীয় ধর্মীয় নেতা নহে, তাহাদের পক্ষেও এই উদ্দেশ্যে কোন হারাম কাজ করা জায়েয নহে। বরং তাহারা বৈধ কাজ সমূহের মধ্যে এমন কাজ করিতে পারিবে যাহা করিলে মানুষের মধ্যে তাহাদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। নিম্নে এই জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হইল-

এক বাদশাহ এক বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। বাদশাহ যখন সেই বুজুর্গের খানকার কাছাকাছি পৌঁছাইলেন, তখন বুজুর্গ বাদশাহর আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কিছু খাবার আনাইয়া বড় কদর্যভাবে গোগ্রাসে উহা খাইতে শুরু করিলেন। বাদশাহ নিকটে আসিয়া বুজুর্গকে এইভাবে খাইতে দেখিয়া তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তাহার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বাদশাহ চলিয়া যাওয়ার পর বুজুর্গ স্বস্থির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন যে, আল্লাহ পাক তাহাকে বাদশাহর সংশ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অপর এক বুজুর্গ শরাবের রং এর শরবত পান করিতেন। তাহাও আবার শরাবের নির্দিষ্ট পেয়ালাতেই পান করিতেন যেন লোকেরা তাহাকে শরাবখোর মনে করে। বুজুর্গের এই আচরণ দেখিয়া একে একে সকলে তাহাকে বর্জন করিয়া চলিয়া গেল।

অবশ্য ফেকাহশাস্ত্র মতে এই ধরনের কার্যকলাপ জায়েয হইবে কি-না তাহাতে সন্দেহ আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন কোন বুজুর্গ এইভাবেই আপন আত্মার এসলাহ ও সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু ফেকাহশাস্ত্রবিদ ও মুফতীগণ তাহাদের এই কর্ম শরীয়ত সম্মত বলিয়া অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণ এই পদ্ধতির উপর আমল করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন। অবশ্য পরে তাহারা এইরূপ বাড়াবাড়ির ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়াছেন।

অপর এক বুজুর্গের ঘটনা এইরূপ- লোকসমাজে তাহার বুজুর্গীর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িলে ক্রমে তাহার নিকট লোকসমাগম বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এক পর্যায়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি হইল যে, তাহার নিয়মিত এবাদত-বন্দেগী করাই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। পরে তিনি এই অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। সেমতে এক দিন তিনি মহল্লার সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করিলেন এবং গোসল শেষে বাহির হওয়ার সময় ইচ্ছা করিয়াই অপর এক ব্যক্তির মূল্যবান পোশাক গায়ে জড়াইয়া দ্রুত বাহির হইয়া আসিলেন।

এদিকে সেই পোশাকের মালিক তাহার মূল্যবান পোশাকটি যথাস্থানে না পাইয়া যারপর নাই পেরেশান হইল এবং তাহা "চুরি হইয়া গিয়াছে" এই মর্মে ঘোষণা দিয়া খোঁজাখুঁজি শুরু করিল। পরে তাহারা দেখিতে পাইল, সেই বুজুর্গ চুরি যাওয়া পোশাকটি গায়ে জড়াইয়া প্রকাশ্য রাজ পথে দিব্যি দাঁড়াইয়া আছেন। আর যায় কোথায়- অমনি চুরির অপরাধে চতুর্দিক দিক হইতে তাহার উপর কিল-ঘুষি শুরু হইয়া গেল।

উপরোক্ত ঘটনার পর দেশময় তাহার দুর্নাম ছড়াইয়া পড়িল যে, কথিত বুজুর্গ আসলে একজন চোর। অতঃপর তাহার নিকট লোকসমাগম একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। অর্থাৎ এইভাবেই তিনি মানুষের নজর হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নীরবে আল্লাহর এবাদতে মশগুল হইলেন।

যশ-খ্যাতির মোহ দূর করিবার উপায়

যশ-খ্যাতি নির্মূল করার উত্তম উপায় হইল, মানুষের সংশ্রব বর্জনপূর্বক নির্জনতা অবলম্বন করিয়া এমন স্থানে চলিয়া যাওয়া যেখানে কেহ তাহাকে চিনিতে না পারে। যেই শহরে খ্যাত হইয়াছে, সেই শহরেই নিজ ঘরে নির্জনবাস অবলম্বন করিলে পূর্বাধিক খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে।

কেননা, এমতাবস্থায় গোটা এলাকায় প্রচার হইয়া যাইবে যে, অমুকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যেন তাহার নির্জনবাসই প্রসিদ্ধি লাভের কারণে পরিণত হইবে। এই অবস্থাটি আরো নাজুক। কারণ, এই ক্ষেত্রে এমনও হইতে পারে যে, সেই নির্জনবাসী ব্যক্তি এমন ধারণা করিতে শুরু করিবে যে, আমার অন্তর হইতে যশ-খ্যাতির মোহাব্বত দূর হইয়া গিয়াছে– অথচ তাহার অন্তরের কোন গহিন কোণে হয়ত উহার মোহাব্বত সুপ্ত থাকিবে। এই অবস্থায় তাহার নফস হয়ত বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কল্পনায় প্রশান্তি লাভ করিবে। কিন্তু সে যদি এই কথা জানিতে পারে যে, মানুষ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহে কিংবা তাহারা আমার সমালোচনা করে, তবে আত্মার সেই প্রশান্তি নিঃশেষ হইয়া তদস্থলে এমনই পেরেশানীর উদ্ভব হইবে যে, অতঃপর মানুষের অন্তরে তাহার সম্পর্কে সৃষ্ট কুধারণা সমূহ দূর করার জন্য সে চেষ্টা-তদ্বির শুরু করিয়া দিবে। এমনকি এই ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদি যেকোন উপায় অবলম্বন করিতেই সে পিছপা হইবে না।

এইসব ক্রিয়া-কর্ম দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিল। তাহার অন্তরে সম্পদের মোহাব্বতের মত যশ-খ্যাতির মোহাব্বতও আগের মতই বিদ্যমান। মানুষ যত দিন অপরের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য লালায়িত থাকে, তত দিনই সে মানুষের অন্তরে আসন স্থাপনের জন্য উদ্গ্রীব থাকে। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি গায়ে খাটিয়া অর্থ উপার্জন করে এবং অপরের সম্পদের প্রতি কোনরূপ নজর না করে তবে অপরাপর কোন মানুষকেই সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিবে না এবং তাহার সম্পর্কে কে কি ধারণা পোষণ করিল এই বিষয়েও তাহার কোন মাথা ব্যথা থাকিবে না।

মানুষ দ্বারা উপকৃত হওয়ার এই লালসা শুধু কানাআ'ত বা অল্পেতুষ্টি দ্বারাই নির্মূল হইতে পারে। যেই ব্যক্তি অল্পেতুষ্ট, সে কখনো মানুষ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কেহ তাহার প্রতি খারাপ ধারণা করিলেও তাহার কিছু আসে যায় না এবং কেহ তাহার প্রতিশ্রদ্ধা পোষণ করিলেও সে কোনরূপ পুলক অনুভব করে না।

মোটকথা, অল্পেতুষ্টি ও লোভ-লালসা বর্জন ছাড়া যশ-খ্যাতির মোহ নির্মূল হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে আমরা যশ-খ্যাতির নিন্দা এবং নির্জনবাসের উপকারিতার যেই সব বিবরণ উল্লেখ করিয়াছি, উহার আলোকে নিজেদের কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের আকাবেরে দ্বীন ইজ্জতের তুলনায় অপমানকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পারলৌকিক ছাওয়াব অর্জনকেই অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন।

প্রশংসাপ্রীতির চিকিৎসা

প্রশংসার মোহ ও লোকনিন্দার ভয় এমন দুইটি মারাত্মক ব্যাধি যে, অধিকাংশ মানুষ উহাতে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংস হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকেরা যাবতীয় কাজকর্ম মানুষের মর্জি অনুযায়ী করে যেন সকলেই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার প্রশংসা করে এবং কাহারো পক্ষ হইতেই কোনরূপ নিন্দার আশংকা না থাকে। ইহা এমন এক মারাত্মাক ব্যাধি যে, ইহাতে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের সর্বনাশ হইতে আর কিছুই বাকী থাকে না। সুতরাং এই ব্যাধির চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। এই চিকিৎসার সহজ উপায় হইল, প্রথমেই দেখিতে হইবে, কি কি কারণে প্রশংসার প্রতি মোহ ও নিন্দার প্রতি ঘৃণা পয়দা হয়।

প্রথম কারণ

ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, প্রশংসাকারীর উক্তির মাধ্যমেই প্রশংসিত ব্যক্তি নিজের যোগ্যতা ও পূর্ণতার কথা জানিতে পারে। এই ক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তির কর্তব্য, সেই ব্যক্তির প্রশংসায় প্রতারিত না হইয়া নিজের জ্ঞান ও বিবেকের নিকট প্রশ্ন করা যে, যেই গুণ ও যোগ্যতার কথা উল্লেখ করিয়া তোমার প্রশংসা করা হইতেছে, বাস্তবেও উহা তোমার মধ্যে বিদ্যমান কি-না। যদি বিদ্যমান থাকে, তবে উহার প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া যায় কি-না। প্রকাশ থাকে যে, মানুষের জন্য আনন্দিত হওয়ার মত গুণ হইল– এলেম, তাকওয়া ও যুহদ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ধনৈশ্বর্য ও পার্থিব বিষয়-সম্পদ দ্বারা আনন্দিত হওয়ার সঙ্গত কোন কারণ নাই। তো যেই গুণটির উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করা হইল, উহা যদি পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত হয়, তবে উহার উপর আনন্দিত হওয়ার অর্থ যেন তুচ্ছ তৃণলতার মালিক হওয়ার কারণে আনন্দিত হওয়া– যাহা দুই দিন পরেই শুকাইয়া বাতাসের সঙ্গে উড়িয়া যাইবে। তা ছাড়া যুক্তির নিরীখেও পার্থিব বিষয়ের প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া সঙ্গত নহে। কেননা, তুমি তো আনন্দিত হইতে পার আলোচ্য গুণটি তোমার মধ্যে বিদ্যমান থাকিলে– নিছক প্রশংসাকারীর প্রশংসার কারণে নহে। আর সেই গুণটি তো পূর্ব হইতেই তোমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল– যাহা আনন্দিত হওয়ার মূল কারণ। সুতরাং মানুষের প্রশংসায় কি কারণে তুমি আনন্দিত হইবে? বরং এইভাবে আনন্দিত হইলে উহার অর্থ দাঁড়াইবে– প্রশংসার কারণেই সেই গুণটি তোমার মধ্যে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তো এইরূপ নহে। বরং ঐ গুণটি পূর্ব হইতেই তোমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তাছাড়া আলোচ্য গুণটি যদি এলেম, তাক্ওয়া ও যুহদ সংক্রান্ত হয়, তবুও উহার উপর আনন্দিত হওয়া ঠিক নহে। কেননা অন্তিম অবস্থা, কার কেমন

হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেই গুণটি জীবনের শেষ পর্যন্ত বহাল থাকিবে কি-না তাহাও জানা নাই। অবশ্য এই কথা সত্য যে, এলেম, তাকওয়া ও যুহদ ইত্যাদি বিষয়গুলি আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ হয়। কিন্তু শেষ পরিণতি ভাল হইবে না মন্দ হইবে, এই আশংকা সর্বদা লাগিয়াই থাকে। সুতরাং যেখানে শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার আশংকা বিদ্যমান, সেই ক্ষেত্রে মানুষ কেমন করিয়া দুনিয়ার কোন বস্তুর উপর আনন্দিত হইতে পারে? বরং এমতাবস্থায় সে মনে করিবে, দুনিয়া পেরেশানীর জায়গা- আনন্দের নহে; দুনিয়া কষ্টের জায়গা– সুখের নহে।

পক্ষান্তরে তোমার শেষ পরিণতি উত্তম হওয়ার ব্যাপারে তুমি যদি আশাবাদী হও; তবে সেই ক্ষেত্রেও প্রশংসাকারীর প্রশংসায় খুশী না হইয়া বরং আল্লাহ পাকের সেই অনুগ্রহের উপর খুশী হওয়া উচিৎ– যাহা এলেম ও তাকওয়ার আকারে তোমাকে দান করা হইয়াছে। কারণ, মানুষের যোগ্যতা ও পূর্ণতার অনুভূতির ফলেই আনন্দ অনুভূত হয়। আর মানুষের মধ্যে এই যোগ্যতা ও পূর্ণতা পয়দা হয় আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে– প্রশংসাকারীর প্রশংসার কারণে নহে। সুতরাং যদি আনন্দিত হইতেই হয়, তবে তাহা আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে হইবে– মানুষের প্রশংসার কারণে নহে।

এদিকে যেই গুণটির উল্লেখ করিয়া তোমার প্রশংসা করা হইল, সেই গুণটি যদি তোমার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে, তবে এইরূপ প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া বোকামী ছাড়া আর কিছুই নহে। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ– এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে মজাক করিয়া বলিল, আপনার পেটের ময়লা এমনই সুবাসিত যে, আপনি যখন মল ত্যাগ করেন, তখন উহার সুবাসে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া ওঠে। অথচ সেই ব্যক্তি ইহা ভাল করিয়াই জানে যে, তাহার পেট দুর্গন্ধযুক্ত ময়লায় ভর্তি এবং উহাতে আদৌ কোন সুবাস নাই। তখন এইরূপ প্রশংসা শুনিবার পরও যদি কেহ আনন্দিত হয়, তবে তাহাকে বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কি বলা যাইবে? অনুরূপভাবে কেহ যদি তোমার এলেম-তাকওয়া ও নেক আমলের উল্লেখ করিয়া তোমার প্রশংসা করে, আর তুমি জান যে, এইসব সদ গুণের সহিত তোমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই; তবে এইরূপ প্রশংসায় আনন্দিত হওয়াও অনুরূপ পাগলামীর মতই বটে। তোমার ভিতর কি কি গুণ আছে, তোমার যোগ্যতা ও ক্ষমতা কতটুকু এবং তুমি কি পরিমাণ নেক আমলের অধিকারী– এইসব বিষয় আল্লাহ পাক ভাল করিয়াই জানেন। সুতরাং মানুষের মিথ্যা প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নাই। আর প্রশংসাকারী যদি তোমার সত্য প্রশংসাও করে, তবে সেই ক্ষেত্রেও তাহার প্রশংসায় আনন্দিত না হইয়া বরং তোমার উপর প্রদত্ত আল্লাহর নেয়মতের উপরই আনন্দিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় কারণ

মানুষের প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হইল, কোন ব্যক্তি যখন কাহারো প্রশংসা করে, তখন সেই প্রশংসিত ব্যক্তির অন্তরে এই বিশ্বাস পয়দা হয় যে, প্রশংসাকারীর অন্তর তাহার অনুগত এবং সে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইহার পরিণতি যশপ্রীতির পরিণতির মতই অভিন্ন। এই অবস্থাটির চিকিৎসা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষের নিকট কোন কিছুই প্রত্যাশা করিবে না এবং যাহাকিছু চাহিবার কেবল আল্লাহ পাকের নিকটই চাহিবে। আর এই বাস্তবতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, মানুষের নিকট ইজ্জত-সম্মান ও মর্যাদার 'প্রত্যাশা' বান্দাকে আল্লাহ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। এই কারণেই মানুষের প্রশংসায় আনন্দিত হইতে নাই।

তৃতীয় কারণ

তৃতীয় কারণ হইল, প্রশংসা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, প্রশংসাকারী প্রশংসিত ব্যক্তির প্রভাব দ্বারা ভীত ও প্রভাবিত। বস্তুতঃ এইরূপ প্রভাব ও ক্ষমতা একটি অস্থায়ী বিষয় এবং ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। এমন অস্থায়ী ও বিলীয়মান প্রশংসার উপর আনন্দিত হওয়া জ্ঞানবানের কাজ নহে। বরং এইরূপ প্রশংসার উপর ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হওয়া উচিৎ। কেননা, এইরূপ প্রশংসা দ্বারা সে তাহাকে অনিষ্ট ও বিপদের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

এক বুজুর্গ বলেন, যেই ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা দ্বারা আনন্দিত হয়, সে যেন শয়তানকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করার পথ করিয়া দেয়। অন্য এক বুজুর্গ বলেন, কাহারো মুখ হইতে এই কথা শুনিতে যদি তোমার ভাল না লাগে যে, "তুমি মন্দ লোক" বরং মানুষের মুখ হইতে তোমার যদি এই কথা শুনিতে ভাল লাগে যে, "তুমি একজন ভাল মানুষ"– তবে উহার অর্থ দাঁড়াইতেছে, আসলেই তুমি একজন "মন্দ লোক"।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ "খবরদার! তোমরা একে অপরের প্রশংসা করিও না। আর প্রশংসাকারীকে দেখিলে তাহার মুখে মাটি নিক্ষেপ করিবে।"

এই কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম প্রশংসাকে ভয় করিতেন। একবার খোলাফায়ে রাশেদীনের একজন এক ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি আমার তুলনায় উত্তম এবং আপনার এলেমও আমার তুলনায় অনেক বেশী। খলীফা সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া লোকটিকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে আমার গুণ-কীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতে বলিয়াছি? জনৈক ছাহাবী এক ব্যক্তির মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! এই ব্যক্তি এমন বিষয় দ্বারা আমার সন্তুষ্টি কামনা করিতেছে যেই

বিষয়ের উপর তুমি অসন্তুষ্ট হও। আমি তোমাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি এই ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট।

আল্লাহর নেক বান্দাগণ মানুষের প্রশংসাকে এই কারণে ঘৃণা করিতেন যে, উহার ফলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। তাহারা এই কথা ভাল করিয়াই জানিতেন যে, আল্লাহ পাক আমাদের ভিতর-বাহিরের সব অবস্থাই জানেন এবং আমাদের গোনাহ ও পাপাচার সম্পর্কেও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং মানুষ প্রশংসা করিলেই আমাদের গোনাহ হ্রাস পাইবে না এবং উহাতে বৃদ্ধিও ঘটিবে না। সেই ব্যক্তিই উত্তম যে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করিয়াছে। আর সবচাইতে অধম সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং যেই ব্যক্তির প্রশংসা করা হইতেছে, সেই ব্যক্তি যদি আল্লাহ পাকের নিকট মন্দ হয়, আর তাহার শেষ পরিণতি হয় জাহান্নাম; তবে মানুষের প্রশংসায় তাহার আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নাই। আর সেই ব্যক্তি যদি জান্নাতী হয়, তবে মানুষের প্রশংসায় খুশী না হইয়া বরং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের কারণেই খুশী হওয়া উচিৎ। মানুষ তো মানুষের কিছুই করিতে পারে না। হায়াত-মউত, রিজিক-দৌলত; সবই আল্লাহর হাতে। এই মৌলিক বিশ্বাস যদি মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হয়, তবে মানুষের প্রশংসা বা নিন্দার কারণে সে কিছুতেই প্রভাবিত হইবে না।

নিন্দাকে ঘৃণা করার চিকিৎসা

ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, মানুষ যেই কারণে নিন্দাকে ঘৃণা করে, ঠিক উহার বিপরীত কারণে প্রশংসাকে মোহাব্বত করে। সুতরাং প্রশংসার মোহাব্বতের চিকিৎসা দ্বারাই ঘৃণাকে নিন্দা করার চিকিৎসা কি তাহা জানা যাইবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল– যেই ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে তাহার অবস্থা নিম্ন বর্ণিত তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় অবশ্য সংশ্লিষ্ট হইবে–

(এক) তোমার নিন্দাকারী ব্যক্তি যদি তাহার বক্তব্যে সত্যবাদী হয় এবং তোমার মঙ্গলার্থেই নিন্দা করিয়া থাকে, তবে তাহার কথায় রাগ করা, তাহার সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করা কিংবা এই নিন্দার জবাবে পাল্টা তাহার নিন্দা করা উচিৎ হইবে না। কেননা, এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য খারাপ নহে; সে তোমার অপরাধ বিষয়ে সতর্ক করিয়া তোমাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে চাহিতেছে। সুতরাং এই ব্যক্তির নিন্দায় বরং খুশী হইয়া তোমার নিন্দাযোগ্য অপরাধগুলি দূর করার চেষ্টা করা চাই। মোটকথা, নিন্দাকারীর বক্তব্য দ্বারা যদি সত্যিকার অর্থেই তোমার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করিয়া তোমাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার নিন্দায় ক্রুদ্ধ হওয়া উহা অপছন্দ করা কিংবা তাহাকে তিরস্কার করা উচিৎ নহে।

(দুই) নিন্দাকারী যদি তোমার সঙ্গে শত্রুতার কারণে এবং তোমাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তোমার নিন্দা করিয়া থাকে; তবুও তাহার কথায় রাগ না করিয়া বরং তোমার খুশীই হওয়া উচিৎ। কেননা, তাহার নিন্দার কারণে তুমি নিজের এমনসব ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিলে– যাহা তোমার জানা ছিল না। কিংবা তোমার এমন কতক অবস্থা যেইগুলিকে তুমি নিজের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করিতে অথচ প্রকৃতপক্ষে সেইগুলি যে তোমার নেহায়েতই মন্দ স্বভাব ছিল– তাহা নিন্দুকের সমালোচনার কারণেই তুমি জানিতে পারিলে। সুতরাং নিন্দুকের এই জাতীয় সমালোচনা তোমার জন্য সৌভাগ্যের কারণই বটে। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ–

মনে কর, তুমি কোন বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছ। এই সময় তোমার পরিধেয় বস্ত্রটি ছিল নাপাক ও ময়লা এবং দুর্গন্ধযুক্ত। পথে এক ব্যক্তি তোমাকে ডাকিয়া বলিল, হে ক্লেদাক্ত ও কুৎসিত! বাদশাহর দরবারে যাওয়ার পূর্বে তোমার পরিধেয় বস্ত্র পাক-সাফ করিয়া লও। তো এই ব্যক্তির এই মৌখিক সতর্কবাণী তোমার জন্য গনীমত বটে। মানুষের যাবতীয় গর্হিত চরিত্র পরকালের জন্য বরবাদীর কারণ হইবে। আর মানুষ নিজের এইসব গর্হিত চরিত্র নিন্দাকারীর নিন্দার মাধ্যমেই জানিতে পারে। সুতরাং তোমার ভাগ্যে যদি এমন একজন নিন্দাকারীর ব্যবস্থা হয়, যে তোমাকে পারলৌকিক বরবাদীর কারণগুলি চিহ্নিত করিয়া উহা হইতে সতর্ক হওয়ার সুযোগ করিয়া দিবে, তবে তো উহাকে গনীমতই মনে করিতে হইবে। নিন্দাকারী যদি তোমার অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে তোমার পিছনে লাগিয়া থাকে, তবে উহার ফলে তাহার দ্বীন বরবাদ হইবে– তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। বরং তাহার নিন্দার কারণে তোমার উপকারই হইবে। সুতরাং তাহার নিন্দার উপর তুষ্ট হইয়া উহা দ্বারা তুমি উপকৃত হওয়ারই চেষ্টা করা উচিৎ। নিন্দাকারী যদি তাহার নিজের জালানো আগুনে আত্মাহুতি দেয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তোমার তো করিবার কিছু নাই।

(তিন) নিন্দাকারী যদি তাহার কথায় মিথ্যাবাদী হয়, অর্থাৎ সে যদি তোমার এমন দোষ বর্ণনা করে যাহা তোমার মধ্যে নাই, তবে তাহার এই মিথ্যা নিন্দার কিছুমাত্র পরওয়া করিবে না। এবং উহার জবাবে তুমিও তাহার কোন নিন্দা করিবে না। বরং এই ক্ষেত্রে তুমি নিম্ন বর্ণিত তিনটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতে পার–

(ক) প্রথমতঃ যদিও তুমি নিন্দাকারীর বর্ণিত সেই বিশেষ দোষটি হইতে মুক্ত, কিন্তু এমন বহু দোষ তোমার মধ্যে বিদ্যমান যাহা আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তোমার পক্ষে আল্লাহ পাকের শোকর

আদায় করা কর্তব্য যে, তিনি দয়াপরবশ হইয়া তোমার অসংখ্য দোষ-ত্রুটি গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। আর নিন্দাকারী কেবল তোমার এমন একটি দোষের কথা প্রচার করিয়াছে, যাহা বাস্তবে তোমার মধ্যে বিদ্যমান নহে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ নিন্দাকারী কর্তৃক তোমার দোষ অন্বেষণ এবং উহা প্রচার করিয়া বেড়ানোর ফলে উহা তোমার গোনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইতেছে। অর্থাৎ যেই দোষে তুমি দুষ্ট নও, এমন একটি দোষ প্রচার করিয়া নিন্দাকারী যেন তোমার অসংখ্য দোষ ঢাকিয়া দিতেছে। কেননা, এই ক্ষেত্রে মানুষ মনে করিবে, তোমার মধ্যে যদি আরো কোন দোষ থাকিত, তবে তো সেইসব দোষও সে প্রচার করিয়া বেড়াইত। স্মরণ রাখিও, নিন্দাকারী তোমার নামে নিন্দা করিয়া সে যেন তাহার নেকীসমূহ তোমার খেদমতে হাদিয়া পেশ করিতেছে। আর যেই ব্যক্তি তোমার প্রশংসা করে, সে যেন তোমার পিঠের উপর সজোরে আঘাত করিতেছে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, নিজের পিঠের উপর আঘাত পাইয়া তুষ্ট হওয়া– আর মোফতে অসংখ্য নেকী পাইয়া অসন্তুষ্ট হওয়া, ইহা তো কোন বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে না। আর তুমি তাহার পক্ষ হইতে নেকী প্রাপ্ত হইতেছ, উহা তোমার জন্য আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের কারণ হইবে।

(গ) সেই নিন্দাকারী বেচারা তোমার নিন্দা করিয়া তাহার নিজেরই দ্বীন বরবাদ করিতেছে। এই সর্বনাশা অপরাধের কারণে সে আল্লাহ পাকের রহমতের নজর হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ভয়াবহ আজাবের শিকার হইতেছে। এখন কি তুমি এই অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে আরো কষ্ট দিবে? সে তো এমনিতেই আল্লাহর আজাবে নিপতিত হইয়া ধ্বংসের অতলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অতঃপর এই অসহায় ব্যক্তিটির জন্য আরো গজবের দোয়া করিয়া তুমি শয়তানকে খুশী করিতে পার না। তুমি বরং তাহার জন্য এইরূপ দোয়া করিতে পার– আয় আল্লাহ! তাহাকে আত্মসংশোধনের সুযোগ করিয়া দাও, তাহার উপর রহম কর এবং তাহাকে তওবা করিবার তাওফীক দান কর। যেমন ওহোদ যুদ্ধে যাহারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান্দান মোবারক শহীদ করিয়াছিল, পবিত্র চেহারা ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল এবং তাহার পিতৃব্য হযরত আমীর হামজা (রাঃ)-কে শহীদ করিয়াছিল, তাহাদের জন্য তিনি এইরূপ দোয়া করিয়াছিলেন–

اللهم اغفر لقومي، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون

অর্থঃ "আয় আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা কর। আয় আল্লাহ! আমার কওমকে হেদায়েত কর। কেননা, তাহারা অজ্ঞ।" (বায়হাকী, দালায়েলুন্নবুওয়্যাহ)

এক ব্যক্তি হযরত ইবরাহিম বিন আদহামকে আঘাত করার পর তিনি

তাহার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, লোকটি তো আপনার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করিল, অথচ আপনি তাহার জন্য কল্যাণের দোয়া করিলেন, ইহার কারণ কি? জবাবে হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম বলিলেন, লোকটির এই অন্যায় আচরণের কারণে আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হইব। সুতরাং যেই ব্যক্তির কারণে আমি উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হইব, সেই ব্যক্তিকে আজাব দেওয়া হউক– ইহা আমি কামনা করিতে পারি না। এই কারণেই আমি তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়াছি।

আল্লাহ পাক যাহাদিগকে অল্পেতুষ্টি ও কানাআত দান এবং মানুষের নিকট হইতে যাহারা কোন কিছু প্রত্যাশা করে না, এইরূপ লোকেরা মানুষের নিন্দায় কখনো অসন্তুষ্ট হয় না। তুমি যদি মানুষের নিকট হইতে অমুখাপেক্ষী হইতে পার, তবে মানুষ তোমার যতই নিন্দা করুক না কেন, উহা তোমার অন্তরে কিছুমাত্র ক্রিয়া করিবে না। অল্পেতুষ্টি ও কানাআত মানুষের জন্য এক বিরাট সম্পদ। যেই ব্যক্তি এই কানায়াত হাসিল করিতে পারিয়াছে, তাহার অন্তর হইতে ধন-সম্পদ ও যশ-খ্যাতির মোহাব্বত অবশ্যই দূর হইয়া যাইবে। যতদিন তোমার অন্তরে চাহিদা ও লোভ-লালসা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি ইহাই কামনা করিবে যে, যেই ব্যক্তির নিকট আমি কিছু প্রত্যাশা করি, সেই ব্যক্তির অন্তরে যেন আমার মোহাব্বত এবং আমার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকে এবং সে যেন আমার প্রশংসা করে। তুমি নিজেও সেই ব্যক্তিকে আমার অনুরক্ত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকিবে। এই ক্ষেত্রে সবচাইতে ক্ষতিকর বিষয় হইল, মানুষের নিকট এইরূপ প্রত্যাশা ও কামনা-বাসনা মানুষের দ্বীনকে বরবাদ করিয়া দেয়।

প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থার প্রকার ভেদ

প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা চারি প্রকার–

প্রথম অবস্থা

এই ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থা হইল, প্রশংসার উপর খুশী হওয়া এবং প্রশংসাকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অনুরূপভাবে নিন্দার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া এবং নিন্দাকারীর সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করা। তাহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা বা উহার ইচ্ছা পোষণ করা। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। এখানে পর্যায়ক্রমে যেই চারি প্রকার অবস্থার কথা বর্ণনা করা হইবে, উহার মধ্যে এই প্রথম প্রকারের অবস্থাটির গোনাহ সবচাইতে বেশী।

দ্বিতীয় অবস্থা

দ্বিতীয় অবস্থা হইল, নিন্দার কারণে মনে মনে অসন্তুষ্ট হওয়া কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ না করা এবং উহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা না করা। অনুরূপভাবে নিজের প্রশংসা শুনিয়া মনে মনে খুশী হওয়া কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গ-অবয়ব দ্বারা তাহা প্রকাশ না করা। এই অবস্থাটিও দোষণীয় বটে। তবে প্রথম অবস্থার তুলনায় এই দ্বিতীয় অবস্থাকে উত্তম বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় অবস্থা

তৃতীয় অবস্থা হইল- প্রশংসায় কোনরূপ খুশী না হওয়া এবং নিন্দার কারণেও কষ্ট অনুভব না হওয়া। অর্থাৎ- তাহার নিকট প্রশংসাও যেমন, নিন্দাও তেমন এবং এইসব দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত না হওয়া। এই প্রসঙ্গে এই তৃতীয় অবস্থাটিকে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে।

চতুর্থ অবস্থা

এই ক্ষেত্রে চতুর্থ অবস্থাটি হইল সমস্ত এবাদতের নির্যাস। অর্থাৎ প্রশংসাকে সরাসরি খারাপ মনে করা এবং প্রশংসাকারীকে তিরস্কার করা। কেননা, এই প্রশংসা তাহার জন্য ফেৎনা, উহা তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া দেয় এবং এই অবস্থাটি তাহার দ্বীনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

উহার পাশাপাশি নিন্দাকারীকে মোহাব্বত করা। কেননা, এই নিন্দাকারী তাহার অপরাধসমূহ চিহ্নিত করিয়া উহা হইতে তওবা করার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয় এবং সে নিজের গোনাহসমূহ তাহাকে দিয়া দেয়।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন-

رأس التواضع ان تكره ان تذكر بالبر و التقوى

অর্থঃ "উত্তম বিনয় হইল, তোমাকে নেককার ও মোত্তাকী হিসাবে উল্লেখ করিলে তাহা তোমার নিকট খারাপ মনে হওয়া।"

এই প্রসঙ্গে অপর এক হাদীসে আরো কঠোরতার সহিত বলা হইয়াছে-

ويل للصائم و ويل للقائم، و ويل لصاحب الصوف الا من ؟ فقيل يا رسول الله ؟ الا من ؟ فقال إلا من تنزهت نفسه من الدنيا و بغض المدحة و استحب المذمة .

অর্থঃ "রোজাদারদের জন্য দুর্ভোগ, রাত জাগরণকারীদের জন্য দুর্ভোগ, কম্বল মোড়া দানকারীদের জন্য দুর্ভোগ, কিন্তু এমন কতক লোক ছাড়া। লোকেরা আরজ করিল, 'কিন্তু এমন কতক লোক কাহারা'? তিনি এরশাদ

করিলেনঃ এমন লোক যার আত্মা দুনিয়ার নাপাকি হইতে পবিত্র, যেই ব্যক্তি প্রশংসা অপছন্দ করে এবং নিন্দাকে পছন্দ করে।"

উপরে প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে মানুষের চারিটি অবস্থা বর্ণনা করা হইল। আমাদের মত মানুষের পক্ষে কেবল দ্বিতীয় অবস্থাটির উপরই আমল করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রশংসা শুনিয়া মনে মনে খুশী হওয়া কিন্তু মুখে বা অঙ্গ-অবয়ব দ্বারা তাহা প্রকাশ না করা। তদ্রূপ নিন্দার কারণেও মনে মনে কষ্ট পাওয়া কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ না করা। বর্ণিত তৃতীয় অবস্থাটিতে সংশ্লিষ্ট হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সেই স্তরটির অবস্থা হইল- প্রশংসাও যেমন- নিন্দাও তেমন। অর্থাৎ এইসব দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত না হওয়া।

কতক লোক এমনও আছে যাহারা নিজের প্রশংসা শুনিয়া খুশী হয় না এবং উহার কারণে কোনরূপ কষ্টও অনুভব করে না। অর্থাৎ এই প্রশংসা যেন কোনভাবেই তাহাদের উপর ক্রিয়া করে না। এই ধরনের লোকেরা ভাগ্যবান বটে। আবার কতক লোক এইরূপও আছে, যাহারা প্রশংসার উপর নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করে বটে, কিন্তু প্রশংসাকারীর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে না। তো এই ক্ষেত্রে সর্বোত্তম স্তর হইল- প্রশংসাকে অপছন্দ করা এবং স্পষ্টরূপে উহার উপর নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া দেওয়া। এই অসন্তোষ যেন কৃত্রিম না হয়- অর্থাৎ যথার্থই অসন্তুষ্ট হইতে হইবে। কারণ, মনে মনে খুশী হওয়া আর মুখে অসন্তোষ প্রকাশ করা ইহা সুস্পষ্টরূপেই মোনাফেকী। এই শ্রেণীর লোকেরা সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে নিজেদের এখলাস ও সততার কথা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে এখলাস ও সততার নাম-গন্ধও থাকে না।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা নিন্দা প্রসঙ্গে মানুষের অবস্থার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া গেল। এই ক্ষেত্রে প্রথম স্তর হইল- নিন্দার উপর সুস্পষ্টরূপে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া দেওয়া। আর সর্বোচ্চ স্তর হইল- নিন্দার উপর সন্তোষ প্রকাশ করা। কিন্তু নিজের নিন্দার উপর সন্তোষ প্রকাশ করা কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হয়, যে নিজের নফসের সঙ্গে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষন করে। বস্তুতঃ মানুষের আত্মা ও নফস বড়ই অবাধ্য এবং উহাতে পাপেরও কোন অন্ত নাই। নফসের ওয়াদা খেলাফী সর্বজন বিদিত এবং উহার প্রতারণা সম্পর্কেও কেহ অজানা নহে। সুতরাং এই নফস মানুষের পক্ষ হইতে এমন ব্যবহারই পাওয়ার যোগ্য- যাহা একজন শত্রুর সঙ্গে করা হয়। মানুষের স্বভাব হইল, সে তাহার শত্রুর নিন্দা শুনিয়া আনন্দিত হয়। তো 'নফস' যখন মানুষের শত্রু বলিয়া সাব্যস্ত হইল, সুতরাং উহার নিন্দা শুনিয়া আনন্দিত হওয়া এবং নিন্দাকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। কেননা, নিন্দাকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মার অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করিয়া তাহার বিরাট উপকার করিয়াছে।

মোটকথা, এই জাতীয় নিন্দা মানুষের জন্য এক বিরাট নেয়ামত ও গনীমত বটে। এই নিন্দার কারণেই সে মানুষের নজরে একেবারে হীন ও নগণ্য সাব্যস্ত হইয়া সর্বনাশা যশ ও খ্যাতি ফেৎনা হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। তাছাড়া এমন অনেক নেক আমল আছে যাহা মানুষ করিতে পারে না। তো এই ক্ষেত্রে এমনও হইতে পারে যে, এই নিন্দা তাহার জন্য নেকীতে পরিণত হইয়া উহা তাহার এমন গোনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে, যেইসব গোনাহ সে দূর করিতে পারিতে ছিল না।

ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, প্রশংসা ও নিন্দা বরাবর মনে হওয়া এবং উহার কোনটি দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত না হওয়া– ইহা এমন এক কঠিন অবস্থা যে, উচ্চ স্তরের সাধকগণের পক্ষেই এইরূপ স্তরে পৌছা সম্ভব। কোন মুরীদ ও সাধক যদি এই স্তর হাসিল করার উদ্দেশ্যে নিজের গোটা জীবন ওয়াক্ফ করিয়া দেয়, তবে সে ইহা ব্যতীত অণ্য কোন কাজ করার সুযোগই পাইবে না। সাধকগণকে উচ্চতর মোকামে পৌছার জন্য যেই কঠিন খাঁটি ও দুরূহ স্তরসমূহ অতিক্রম করিতে হয়– এইটি উহার অন্যতম। ক্রমাগত দীর্ঘ মোজাহাদা ও কঠিন সাধনার পরই ইহা অর্জন করা সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রিয়া

রিয়ার নিন্দা

রিয়া সুস্পষ্ট রূপেই একটি হারাম কর্ম এবং যেই ব্যক্তি রিয়া করে, সে আল্লাহর গজবের শিকার হয়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

অর্থঃ অতএব, দুর্ভোগ সেইসব নামাজীর যাহারা তাহাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর; যাহারা তাহা লোক-দেখানোর জন্য করে (অর্থাৎ রিয়া করে)।

(সূরা মাউনঃ আয়াত ৪.৫.৬)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَ مَكْرُ اُولٰئِكَ هُوَ يَبُوْرُ=

অর্থঃ যাহারা মন্দ কার্যের চক্রান্তে লাগিয়া থাকে তাহাদের জন্যে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি। তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে। (সূরা ফাতিরঃ আয়াত ১০)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে রিয়াকারদের কথা বলা হইয়াছে। অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّ لَا شُكُوْرًا

অর্থঃ তাহারা বলেঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (সূরা আদ দাহরঃ আয়াত ৯)

উপরোক্ত আয়াতে এমন মোখলেস ও আন্তরিক লোকদের প্রশংসা করা হইয়াছে, যাহারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিরই নিয়ত করে। অপর এক স্থানে এরশাদ হইয়াছে–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا =

অর্থঃ অতএব, যেই ব্যক্তি তাহার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাহার পালনকর্তার এবাদতে কাহাকেও শরীক

না করে। (সূরা কাহাফঃ আয়াত ১১০)

উপরোক্ত আয়াতটি এমন লোকদের সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে যাহারা নিজেদের এবাদত ও নেক আমলের বিনিময় কামনা করিত।

রিয়া সম্পর্কিত রেওয়ায়েত

এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ আমলের মধ্যে নাজাত নিহিত? তিনি এরশাদ করিলেন–

ان لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس

অর্থঃ "বান্দা যেন আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে এমন কাজ না করে, যার উদ্দেশ্য হয় মানুষ।" (হাকিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত দাতা, শহীদ ও ক্বারী সম্পর্কিত এক হাদীসে আছেঃ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। দান করার পিছনে তোমার উদ্দেশ্য ছিল যেন লোকেরা তোমাকে দাতা বলে। মুজাহিদকে বলিবেন, তুমিও মিথ্যাবাদী। তুমি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ কর নাই; বরং যুদ্ধ করার পিছনে তোমার উদ্দেশ্য ছিল, যেন লোকেরা তোমাকে বাহাদুর বলে। ক্বারীকে বলিবেন, তুমিও মিথ্যা বলিতেছ, তুমি এই উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করিয়াছ যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ এইসব লোকেরা তাহাদের আমলের ছাওয়াব পাইবে না। রিয়া তাহাদের সকল আমল বরবাদ করিয়া দিয়াছে। (মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

من راءى راءي الله به، و من سمع سمع الله به

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি রিয়া করে, আল্লাহ পাকও তাহার সঙ্গে রিয়া করেন। আর যেই ব্যক্তি তাহা শোনে আল্লাহ পাকও তাহার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করেন।"

(বোখারী, মুসলিম)

এক দীর্ঘ হাদীসে আছে– আল্লাহ পাক ফেরেশতাকে বলিবেন, অমুক ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ কর। কেননা, সে আমার নিয়তে আমল করে নাই।

(ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে "ছোট শিরক" বিষয়ে অধিক ভয়

করিতেছি। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেন, ছোট শিরক হইল রিয়া। উহার পর তিনি এরশাদ করেন–

يقول الله عز و جل يوم القيامة اذا جازى العباد باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء

অর্থঃ "রোজ কেয়ামতে আল্লাহ পাক মানুষের আমলের প্রতিদান দেওয়ার সময় বলিবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাহাদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমল করিতে, তাহাদের নিকট গিয়া দেখ, উহার কোন প্রতিদান পাও কি-না।

(আহমাদ, বায়হাকী)

এক হাদীসে আছে– "তোমরা আল্লাহর নিকট 'হুয্ন' হইতে পানাহ চাও।" ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'হুয্ন' কি? তিনি এরশাদ করিলেনঃ 'হুয্ন' হইল জাহান্নামের একটি উদ্যান যাহা রিয়াকার ক্বারীদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। (তিরমিজী)

এক হাদীসে কুদসীতে আছে–

من عمل في عملا اشرك فيه غيرى فهو له كله و انا منه برئ وانا اغنياء من الشرك

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি অপর কাহাকেও শরীক করিয়া আমার জন্য কোন আমল করে, সে যেন তাহারই হয়, আমি উহা হইতে দূরে। আমি শিরক হইতে সকলের তুলনায় অধিক বেপরওয়া।" (ইবনে মাজা)

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম এরশাদ করেনঃ রোজার হালাতে তুমি মাথা দাড়িতেও তৈল ব্যবহার করিবে এবং তৈলাক্ত হাতটি ঠোঁটের উপর মুছিয়া দিবে। যেন মানুষ ইহা ধারণা করিতে না পারে যে, তুমি রোজাদার। এমনভাবে দান করিবে যেন ডান হাতে দান করিলে বাম হাত জানিতে না পারে। নামাজ পড়ার সময় দরজায় পর্দা ঝুলাইয়া দিবে। আল্লাহ পাক প্রশংসাও তেমনি বণ্টন করেন, যেমন রুজি বণ্টন করেন।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে–

لا يقبل الله عز و جل عملا فيه مثقال ذرة من ريا

অর্থঃ "আল্লাহ পাক এমন কোন আমল কবুল করেন না, যাহাতে বিন্দু পরিমাণও রিয়া আছে।"

একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মোয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)-কে

কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মোয়াজ! তুমি কাঁদিতেছ কেন? জবাবে তিনি বলিলেন, একটি হাদীছ স্মরণ হওয়াতেই কাঁদিতেছি যাহা আমি এই কবরবাসীর নিকট (রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট) শুনিয়াছি। তিনি এরশাদ করিতেন—

ان ادنى الريـاء شـرك

অর্থঃ "সাধারণ রিয়াও শিরকের মধ্যে গণ্য।" (তাবরানী)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন— আমি তোমাদের ব্যাপারে রিয়া ও গোপন খাহেশের আশংকা করিতেছি। বস্তুতঃ গোপন খাহেশও রিয়া বটে।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছেঃ কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন আল্লাহর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকিবে না, তখন আল্লাহর আরশের ছায়ায় এমন লোকেরাই স্থান পাইবে, যাহারা এমনভাবে দান করিত যে, ডান হাতে দান করিলে বাম হাত তাহা টের পাইত না। (বোখারী, মুসলিম)

এক হাদীসে আছে ঃ"গোপন আমল প্রকাশ্য আমলের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী ফজিলতপূর্ণ।" (বায়হাকী)

আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ কেয়ামতের দিন রিয়াকারদিগকে এইভাবে ডাকা হইবে— হে বদকার! হে গাদ্দার! হে রিয়াকার! তোমার আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে, তোমার ছাওয়াব শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন এমন লোকদের নিকট গিয়া উহার বিনিময় প্রার্থনা কর, যাহাদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সেই আমল করিতে। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার খেদমতে আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ আমি আমার উম্মতের শিরকের ব্যাপারে শঙ্কিত। তাহারা না মূর্তি পূজা করিবে, না চাঁদ-সূর্য ও পাথরের পূজা করিবে। তাহারা বরং নিজেদের আমলের মধ্যে রিয়া করিবে। (ইবনে মাজা, হাকিম)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক পৃথিবী সৃষ্টি করিবার পর পৃথিবী উহার মধ্যস্থিত সকল বস্তুসহ কাঁপিতে লাগিল। অতঃপর আল্লাহ পাক পাহাড় সৃষ্টি করিয়া ঐগুলিকে পেরেক স্বরূপ স্থাপন করিলেন। এই সময় ফেরেশতাগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিল যে, আল্লাহ পাক পাহাড় অপেক্ষা শক্ত অন্য কোন বস্তু সৃষ্টি করেন নাই। পরে আল্লাহ লোহা সৃষ্টি করিলেন এবং লোহা পাহাড়কে কাটিয়া দিল। অতঃপর

আল্লাহ আগুন সৃষ্টি করিলেন এবং আগুন লোহাকে গালাইয়া দিল। উহার পর আল্লাহর আদেশে পানি আগুনকে নিভাইয়া দিল। আল্লাহর আদেশ পাইয়া বায়ু পানিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। এই সব অবস্থা দেখিয়া ফেরেশতাদের মধ্যেও এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল যে, সর্বাধিক কঠিন বস্তু কোন্‌টি। পরে তাহারা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিল, আয় পরওয়ারদিগারে আলম! আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে কোন্ বস্তুটি সর্বাধিক কঠিন? এরশাদ হইলঃ আমি আদমের অন্তর অপেক্ষা কঠিন বস্তু আর কিছু সৃষ্টি করি নাই। সে ডান হাতে দান করিলে বাম হাতকে তাহা জানিতে দেয় না। (তিরমিজী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রাঃ) এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন, একদা সেই লোকটি হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর নিকট আরজ করিল যে, আমাকে এমন একটি হাদীস শোনান যাহা আপনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি এমনভাবে কাঁদিতে লাগিলেন যে, এক পর্যায়ে এমন আশংকা হইতে লাগিল যেন আর কোন দিনই তাহার এই কান্না নিবারণ হইবে না। পরে কান্না প্রশমন হইলে তিনি বলিলেন, একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে মোয়াজ! আমি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়া বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হউক, আপনি বলুন। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলিতেছি, তুমি যদি সেই কথাটি স্মরণ রাখ, তবে উপকৃত হইবে, আর ভুলিয়া গেলে আল্লাহর নিকট কোন যুক্তিই কাজে আসিবে না। হে মোয়াজ! আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্বে সাতজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আসমান সমূহ সৃষ্টি করেন এবং প্রতিটি আসমানে ঐ সাতজন ফেরেশতার একজনকে প্রহরী নিযুক্ত করেন। আল্লাহ পাক প্রতিটি আসমানকেই অত্যন্ত আজমত পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করেন।

মানুষের আমলের হেফাজতকারী ফেরেশতা মানুষের সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কৃত আমলসমূহ লইয়া আসমানের দিকে উঠে। মানুষের সেই আমল সূর্যের আলো হইতেও উজ্জ্বল হয়। ফেরেশতা যখন এই আমল লইয়া প্রথম আসমানে যায়, তখন সেখানে নিযুক্ত প্রহরী ফেরেশতা বান্দার আমলের হেফাজতকারী ফেরেশতাকে বলে, এই আমল ফেরৎ লইয়া যাও এবং আমলকারীর মুখের উপর নিয়া নিক্ষেপ কর। আমি গীবতের ফেরেশতা। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন এমন কোন ব্যক্তির আমল উপরের দিকে উঠিতে না দেই যে মানুষের গীবত করে। এই সময় আমল-সংরক্ষণকারী ফেরেশতা বান্দার অন্য কোন আমল বাহির করিয়া দেখায় এবং উহার উসিলায় উপরে আরোহণ করে।

এইভাবে দ্বিতীয় আসমানে যাওয়ার পর তথায় নিযুক্ত প্রহরী ফেরেশতা আমল বহনকারী ফেরেশতাকে বাধা দিয়া বলে, এই আমল ফেরৎ লইয়া গিয়া আমলকারীর মুখের উপর নিয়া নিক্ষেপ কর। এই ব্যক্তি নিজের আমল দ্বারা অমুক পার্থিব বিষয় প্রত্যাশা করিয়াছিল। আমার পরওয়ারদিগার আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন এইরূপ আমল উপরের দিকে যাইতে না দেই। এই ব্যক্তি লোকজনের আসরে বসিয়া গর্ব করিত। অতঃপর আমল বহনকারী ফেরেশতা বান্দার এমন আমল লইয়া উপরে আরোহণ করে, যাহা হইতে নূর বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। ফেরেশতাগণ অবাক বিস্ময়ে বান্দার সেই আমল প্রত্যক্ষ করে।

এইভাবে তৃতীয় আসমানে যাওয়ার পর তথায় নিযুক্ত প্রহরী ফেরেশতা আমল বহনকারী ফেরেশতাকে বাধা দিয়া বলে, এই আমল ফেরৎ লইয়া যাও এবং আমলকারীর মুখের উপর নিয়া নিক্ষেপ কর। আমি অহংকারের ফেরেশতা। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন এইরূপ কোন আমল উপরের দিকে উঠিতে না দেই। এই লোক মজলিসে বসিয়া মানুষের সঙ্গে অহংকার করিত। অতঃপর ফেরেশতা বান্দার এমন আমল লইয়া উপরের দিকে আরোহণ করিবে যাহা উজ্জ্বল তারকার মত জ্বল জ্বল করিতে থাকিবে। ঐ আমল হইতে হজ্ব, ওমরা, নামাজ-রোজা, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি ধ্বনিত হইবে। চতুর্থ আসমানের ফেরেশতা আমল বহনকারী ফেরেশতার গতিরোধ করিয়া বলে, এই আমল বান্দার মুখ, পিঠ ও পেটের উপর গিয়া নিক্ষেপ কর। আমি অহংকার ও আত্মগরিমার ফেরেশতা। আমার আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন এইরূপ কোন আমল উপরের দিকে যাইতে না দেই। এই ব্যক্তি যখনই কোন নেক আমল করিত, তখনই উহার সঙ্গে আত্মগরিমার মিশ্রণ ঘটাইত।

অতঃপর আমল বহনকারী ফেরেশতা বান্দার এমন আমল লইয়া পঞ্চম আসমানের দিকে অগ্রসর হয়, যাহা বাসর রাতের বধুর মত সজ্জিত হয়। সেখানে নিযুক্ত প্রহরী-ফেরেশতা আমলবহনকারী ফেরেশতাকে বাধা দিয়া বলে, এই আমল উহার মালিকের মুখের উপর নিয়া নিক্ষেপ কর এবং উহার বোঝা তাহার ঘাড়ের উপরই রাখিয়া দাও। আমি হিংসার ফেরেশতা। আমার রব আমাকে হুকুম করিয়াছেন, যেন এইরূপ কোন আমল উপরের দিকে উঠিতে না দেই। এই ব্যক্তি এমন লোকদের সঙ্গে চলাফিরা করিত যাহারা তাহার মতই এলেম হাসিল করিয়াছিল এবং তাহার মতই আমল করিত। তবে কেহ তাহার তুলনায় বেশী এবাদত করিলে তাহার সঙ্গে সে হিংসা করিত এবং তাহাকে বিদ্রূপ করিত। অতঃপর আমল বহনকারী ফেরেশতা বান্দার নামাজ-রোজা, হজ্ব-জাকাত, ওমরা ইত্যাদি আমল লইয়া ষষ্ঠ আসমানের দিকে অগ্রসর হয়। তথায় নিযুক্ত প্রহরী ফেরেশতাও তাহাকে বাধা দিয়া বলে, এইসব আমল আমলকারীর মুখের উপর নিয়া নিক্ষেপ কর। আল্লাহর কোন বান্দা কোনরূপ

মুসীবত ও পেরেশানীর শিকার হইলে এই ব্যক্তি তাহাদের উপর রহম করিত না। বরং কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে তাহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। আমি অনুগ্রহ ও রহমের ফেরেশতা। আমার রব আমাকে হুকুম দিয়াছেন, যেন এইরূপ কোন আমল উপরের দিকে যাইতে না দেই।

অতঃপর আমল বহনকারী ফেরেশতা বান্দার নামাজ-রোজা, সদকাহ, জাকাত, মোজাহাদা ও তাকওয়া ইত্যাদি আমল লইয়া সপ্তম আসমানের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে নিযুক্ত প্রহরী ফেরেশতা আমল বহনকারী ফেরেশতাকে বাঁধা দিয়া বলে, এই সব আমল উহার মালিকের মুখের উপর গিয়া নিক্ষেপ কর। আমি এইরূপ আমল উপরের দিকে যাইতে দিব না, যাহা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিলের পরিবর্তে গাইরুল্লাহর নিয়তে করা হইয়াছে। এই ব্যক্তি নিজের আমল ও এবাদতের মাধ্যমে এমন কামনা করিত যেন ওলামা ও ফোকাহাদের মজলিসে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং চতুর্দিকে তাহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন এই জাতীয় কোন আমল উপরের দিকে যাইতে না দেই। এমন সব আমল যাহা আল্লাহর জন্য করা হয় নাই- উহাই রিয়া। আর আল্লাহ পাক রিয়াকারের আমল কবুল করেন না।

অবশেষে আমল বহনকারী ফেরেশতা বান্দার নামাজ, রোজা, হজ্ব, ওমরা, জিকির, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি আমলসমূহ লইয়া সামনে অগ্রসর হয়। এইসব আমলের মিছিলে আকাশের সমস্ত ফেরেশতাও শরীক হয়। এই পর্যায়ে সমস্ত পর্দা সরাইয়া দেওয়া হইলে তাহারা বান্দার নেক আমল সমূহ লইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হইয়া বান্দার নেক আমলের সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমরা আমার বান্দার আমলের হেফাজতকারী, আর আমি আমার বান্দার নফসের নেগরান। বান্দা তাহার আমলের মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের এরাদা করে নাই। বরং তাহার নিয়ত ছিল অন্য কিছু। সুতরাং তাহার উপর আমার অভিশাপ বর্ষিত হউক। এই সময় সমস্ত ফেরেশতা বলিয়া উঠিবে, আয় পরওয়ারদিগার! তাহার উপর আপনার এবং আমাদের অভিশাপ বর্ষিত হউক। গোটা আকাশ মণ্ডলি হইতে আওয়াজ আসিবে, তাহার উপর আল্লাহর এবং আমাদের অভিশাপ বর্ষিত হউক। অতঃপর আসমান ও জমিনের প্রতিটি অনু-পরমাণু হইতে তাহার উপর অভিশাপ বর্ষিত হইবে।

হযরত মোয়াজ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, আপনি আল্লাহর রাসূল আর আমি (অধম বান্দা) মোয়াজ। এখন আমি কি করিব বলিয়া দিন। আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ হে মোয়াজ! তুমি আমার অনুসরণ কর। তোমার যেই সকল ভাই এলমে কোরআনের ধারক ও বাহক, তাহাদের গীবত করিও না। নিজের গোনাহের জন্য নিজেকেই দোষী

করিয়া নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করিতে চাহিও না। অপরের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করিও না এবং দুনিয়ার কাজকে আখেরাতের আমলের সঙ্গে মিশ্রিত করিও না। মানুষের সঙ্গে অহংকার করিও না। কেননা এইরূপ করিলে তোমার বদ আখলাকের কারণে লোকেরা তোমাকে ভয় করিবে। তোমার নিকট একাধিক মানুষ থাকিলে তাহাদের সকলকে বাদ দিয়া একজনের সঙ্গে কানে কানে কথা বলিও না। মানুষেল নিকট নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করিও না। এইরূপ করিলে দুনিয়াতে তোমার বরকত নষ্ট হইয়া যাইবে। মানুষের মানহানী করিও না। অন্যথায় রোজ কেয়ামতে দোজখের কুকুর তোমার গোশত ছিঁড়িয়া ফেলিবে। আল্লাহ পাক বলেন–

وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا =

অর্থঃ "শপথ তাহাদের যাহারা আত্মার বাঁধন খুলিয়া দেয় মৃদুভাবে।"

(সূরা নাযিয়াতঃ আয়াত ২)

হে মোয়াজ! তুমি কি বলিতে পার উহা কি? আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলিয়া দিন উহা কি? এরশাদ হইলঃ উহা দোজখের কুকুর, গোশত ও হাড্ডি দাঁত দ্বারা চিরিয়া ফেলিবে। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হউক, আপনি যেই সব উত্তম স্বভাবের কথা বলিলেন, উহার উপর কাহারা আমল করিতে পারিবে? আর কাহারা দোজখের কুকুর হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ হে মোয়াজ! আল্লাহ পাক যাহাকে তাওফীক দান করিবেন, তাহার পক্ষে উহার উপর আমল করা কোন কষ্টকর নহে। বর্ণনাকারী বলেন, উপরোক্ত হাদীস শোনার পর হইতে হযরত মোয়াজ (রাঃ) অধিকাংশ সময় কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে মশগুল থাকিতেন।

রিয়া সম্পর্কে মহাজনদের উক্তি

একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে মাথা নত করিয়া রাখিতে দেখিয়া বলিলেন– 'বিনয়' মাথানত করিয়া রাখার মধ্যে নহে। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রহঃ) এক ব্যক্তিকে মসজিদে সেজদারত অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, এই আমলটি যদি তুমি নিজের ঘরে করিতে, তবে কতইনা ভাল হইত।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রিয়াকারের লক্ষণ তিনটি–

০ যখন একাকী হয়, তখন অলসতা বাড়িয়া যায়।

০ মানুষ দেখিলেই তৎপর হইয়া উঠে এবং

০ কেহ প্রশংসা করিলে বেশী বেশী আমল করে। আর নিন্দা করিলে তাহার

আমল হ্রাস পায়।

এক ব্যক্তি হযরত ওবাদা ইবনুস্ সামেত (রাঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলেন, আমি তলোয়ার হাতে আল্লাহর পথে এই নিয়তে জেহাদ করিব যেন আল্লাহ পাক আমার উপর সন্তুষ্ট হন এবং মানুষও আমার প্রশংসা করে। এই কথা শুনিয়া হযরত ওবাদা বলিলেন, তবে উহার বিনিময়ে তুমি কিছুই পাইবে না। লোকটি তিনবার এই কথা নিবেদন করিলে প্রতিবারই তিনি এই জবাব দিয়া সবশেষে বলিলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ "আমি সর্বাপেক্ষা বেনিয়াজ ও অমুখাপেক্ষী।"

এক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ)-এর খেদমতে আরজ করিল, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নেক আমল করিয়া এইরূপ প্রত্যাশা করে যেন ঐ আমলের বিনিময়ে সে ছাওয়াব প্রাপ্ত হয় এবং মানুষও তাহার প্রশংসা করে। সে কি ইহা ঠিক করে? জবাবে তিনি বলিলেন, তোমরা কি ইহা কামনা করে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হউক? লোকটি বলিল, আমরা কখনো এইরূপ কামনা করিব না। তিনি বলিলেন, তবে তোমরা সকল আমলই এখলাসের সহিত কেবল আল্লাহর জন্যই করিও।

হযরত জোহ্হাক (রহঃ) বলেন, তোমরা কখনো এইরূপ বলিও না যে, এই আমলটি আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করিতেছি। কিংবা এইরূপও বলিও না যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও স্বজনদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করিতেছি। কেননা, আল্লাহ পাকের কোন শরীক নাই।

একদা হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে চাবুক মারিবার পর লোকটিকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে এই প্রহারের বদলা গ্রহণ কর। লোকটি আরজ করিল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এবং আপনার খাতিরে ক্ষমা করিয়া দিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তো তোমার কিছুই লাভ হইল না। হয় তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার উপর অনুগ্রহ কর, কিংবা আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা কর। লোকটি বলিল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) ফরমাইলেন, এইবার তুমি ঠিক করিয়াছ।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আমি এমন কতক লোকের সাহচর্য লাভ করিয়াছি, যাহাদের অন্তর এলেম ও মারেফাত-জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা যদি সেইসব হেকমতপূর্ণ কথা আলোচনা করিতেন তবে তাহারা নিজেরাও উপকৃত হইতেন এবং শ্রোতাগণও লাভবান হইত। কিন্তু তাহারা প্রসিদ্ধি লাভের ভয়ে নিজেদের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমনকি তাহারা এই প্রসিদ্ধি লাভের আশংকার কারনেই পথ চলাচলের সময় কোন কষ্টদায়ক

বস্তু দেখিলে তাহা সরাইয়া দিতেন না।

রোজ কেয়ামতে রিয়াকারদিগকে এইভাবে আহ্বান করা হইবে- হে গাদ্দার! হে রিয়াকার! হে ক্ষতিগ্রস্ত! হে বদকার! দূর হও এবং আজ এমন ব্যক্তিদের নিকট বিনিময় প্রার্থনা কর যাহাদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে তোমরা আমল করিতে। আজ আমার নিকট তোমাদের কোন বিনিময় নাই।

হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ) বলেন, এক সময় মানুষ আমলের মধ্যে রিয়া করিত। কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়াছে। অর্থাৎ এখন লোকেরা আমল ছাড়া শুধুই রিয়া করে। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক মানুষের আমলের বদলা দেন তাহার নিয়ত অনুযায়ী। কেননা, নিয়তের মধ্যে কোন রিয়া হয় না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি রিয়া করে সে ভাল নহে। কেননা, সে আল্লাহ পাকের তাক্দীরের উপর প্রবল হইতে চাহে। সে কামনা করে যেন মানুষ তাহাকে ভাল মনে করে। যেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট মন্দ, মানুষ তাহাকে কেমন করিয়া ভাল মনে করিবে? মোমেনদের কর্তব্য, এইরূপ ব্যক্তিকে চিনিয়া রাখা। হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, মানুষ যখন রিয়া করে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছে।

হযরত মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, ক্বারী তিন প্রকার- ১. আল্লাহর ক্বারী, ২. দুনিয়ার ক্বারী, ৩. বাদশাহদের ক্বারী। হযরত মোহাম্মদ বিন ওয়াসি' ছিলেন আল্লাহর ক্বারী। হযরত ফোজায়েল বিন আয়াজ (রহঃ) বলেন, কেহ রিয়াকার দেখিতে চাহিলে সে যেন আমাকে দেখে।

মোহাম্মদ ইবনুল মোবারক ছুরী (রহঃ) বলেন, তুমি দিনের বেলা নেক লোকদের অবস্থা অবলম্বন করিও না। দিনের বেলা অপেক্ষা উহা রাতেই অবলম্বন করা উত্তম। কেননা, দিনের বেলা নেক অবস্থা অবলম্বন করিলে উহা হইবে মাখলুকের জন্য; আর রাতের নির্জনে উহা হইবে শুধুই রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে।

হযরত আবু সোলাইমান (রহঃ) বলেন, মানুষের পক্ষে আমল করা অপেক্ষা আমলের হেফাজত করা অধিক কঠিন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রহঃ) বলেন, কতক লোক বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে বটে, কিন্তু বাস্তবে তাহারা খোরাসানেই অবস্থান করে। লোকেরা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যাহারা এই উদ্দেশ্যে তাওয়াফ করে যে, মানুষের মাঝে আমি "তাওয়াফকারী" হিসাবে খ্যাত হইব, তাহারা এইরূপ তাওয়াফের কোন ছাওয়াব পাইবে না। বরং ভিন্ন কোন শহরে সাধারণ কোন প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করা আর এই তাওয়াফের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম

(রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করে, সেই ব্যক্তির ঈমান পূর্ণাঙ্গ নহে।

রিয়ার হাকীকত

প্রকাশ থাকে যে, রিয়া আরবী রুইয়াত ধাতু হইতে উদ্ভূত। রুইয়াত অর্থ দেখা। রিয়া শব্দের অর্থ উত্তম স্বভাব ও কর্ম প্রদর্শন করিয়া মানুষের অন্তরে সম্মান ও মর্যাদা স্থাপনের চেষ্টা করা। এই উত্তম কর্ম এবাদত-বন্দেগী হওয়া জরুরী নহে। বরং অন্য যে কোন কর্মের মাধ্যমেও এই মর্যাদা হাসিল হইতে পারে। তবে সাধারণভাবে রিয়া বলা হয় এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে সম্মানের আসন স্থাপনের প্রচেষ্টাকে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে রিয়াকে চারিভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে-

১. রিয়াকার। অর্থাৎ আবেদ।

২. এমন ব্যক্তি যাহাকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে রিয়া করা হয়।

৩. এমন কর্ম বা এবাদত যার মাধ্যমে রিয়া প্রদর্শন করা হয়।

৪. স্বয়ং রিয়া।

এমন সব বিষয় যাহাতে রিয়া বিদ্যমান

রিয়াকার ব্যক্তি পাঁচটি বিষয়ের মাধ্যমে রিয়া প্রদর্শন করিয়া সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন ও মানুষের অন্তরে সম্মানের আসন পাইতে চাহে। সেই পাঁচটি বিষয় হইল- ১. দেহ, ২. আকার-আকৃতি বা অঙ্গ-অবয়ব, ৩. কথা, ৪. কর্ম এবং অনুসারী বা সাথী-সঙ্গী।

দুনিয়াদার ব্যক্তিও এই পাঁচটি বিষয়ের মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদা হাসিল করে বটে। কিন্তু এবাদত নহে- এমন বস্তুর মাধ্যমে রিয়া করা এবাদতের মাধ্যমে রিয়া করার তুলনায় হাল্কা।

দেহ দ্বারা রিয়া

রিয়ার প্রথম প্রকার হইল দেহ প্রদর্শন করা। উহার পদ্ধতি হইল- দেহের শীর্ণ ও ফ্যাকাশে ভাব প্রদর্শন করা যেন উহার ফলে মানুষ মনে করে যে, এই ব্যক্তি দ্বীনের উপর মেহনত করিতে করিতে একেবারে দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং আখেরাতের ভয়ে সে অনুক্ষণ ভীত ও বিমর্ষ থাকে। অর্থাৎ অনাহার-অর্ধাহারে ক্রমাগত এবাদত-বন্দেগী করার ফলে তাহার দেহটি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং রাতের পর রাত বিনিদ্র এবাদতই তাহার চেহারা ফ্যাকাশে হওয়ার কারণ। অনুরূপভাবে তাহার উস্কখুস্ক চুল এই কথা প্রমাণ করে যে, লোকটি সদাসর্বদা দ্বীনের ফিকিরে ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং অনুক্ষণ এবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকার

ফলে তাহার গলার স্বর ক্ষীণ, ঠোঁট শুষ্ক ও চক্ষু কোটরাগত হইয়া গিয়াছে। আর দেহের এইসব অবস্থা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, লোকটি নিশ্চয়ই সর্বদা রোজা রাখে।

এই কারণেই হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ রোজা রাখিলে সে যেন মাথায় তৈল ব্যবহার করিয়া তৈলাক্ত হাতটি ঠোঁটের উপর মুছিয়া লয় এবং চিরুনী দ্বারা কেশ বিন্যাস করিয়া চোখে সুরমা ব্যবহার করে। যেন লোকেরা তাহাকে রোজাদার বলিয়া অনুমান করিতে না পারে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-ও অনুরূপ নসীহত করিয়াছেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে তাহারা রিয়ার গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্যই এইসব নসীহত করিয়াছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) রোজাদারগণকে বে-রোজাদার মানুষের মত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। মোটকথা, দ্বীনদার লোকেরা উপরে বর্ণিত দেহের বিভিন্ন অবস্থা প্রদর্শনের মাধ্যমে রিয়া করে, আর দুনিয়ার লোকেরা উহার বিপরীতে স্থূল দেহ, সুঠাম শরীর, স্বচ্ছবর্ণ ও দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া রিয়া করে।

আকার-আকৃতি ও পোশাকের মাধ্যমে রিয়া

রিয়ার দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে আকার-আকৃতি, অঙ্গ-অবয়ব ও পোশাকের মাধ্যমে রিয়া প্রদর্শন করা। যেমন মাথার চুল উস্ক-খুস্ক ও এলোমেলো রাখা। গোঁফ মুণ্ডন করা, মাথা নত করিয়া ধীরে ধীরে পথ চলা, কপালে সেজদার চিহ্ন অবশিষ্ট রাখা, মোটা কাপড় পরিধান করা, পশমের জুব্বা ব্যবহার করা, খাটো আস্তিনের জামা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলাইয়া পরিধান করা, ময়লা ও ছিন্ন বস্ত্র ব্যবহার করা- ইত্যাদি। এইগুলি এই কারণে করা হয় যেন লোকেরা তাহাকে সুন্নতের পাবন্দ এবং আল্লাহর নেক বান্দা মনে করে। অনুরূপভাবে তালিযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার, জায়নামাজের উপর নামাজ আদায়, সূফীগণের মত নীল রঙ্গের বস্ত্র ব্যবহার, পাগড়ী বাঁধার পর মাথার উপর সাদা রুমাল জড়াইয়া উহার প্রান্ত চক্ষুর উপর পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখা- এইসবই রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া আলেম না হইয়াও আলেমের মত লেবাস পরিধান করা এবং চলাফেরা ও কথাবার্তায় আলেমদের ভাব প্রদর্শন করা যেন লোকেরা তাহাকেও আলেম মনে করিয়া ইজ্জত করে- এইগুলিও রিয়ার মধ্যে গণ্য।

যাহারা লেবাস-পোশাকের মাধ্যমে রিয়া করে, তাহাদের মধ্যে কতক শ্রেণীভেদ রহিয়াছে। যেমন এক শ্রেণীর লোক নিজেদেরকে জাহেদ ও সাধক হিসাবে জাহির করিয়া নেক লোকদের নিকট ইজ্জত ও সম্মান পাইতে চাহে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা পুরাতন, ময়লা ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে যেন উহা দেখিয়া

লোকেরা মনে করে- দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসের প্রতি ইহাদের কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই। এই শ্রেণীর লোকদিগকে যদি মধ্যম মানের পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করানো হয়- যাহা বুজুর্গানে দ্বীন ব্যবহার করিতেন, তবে উহাতে তাহারা অন্তহীন কষ্ট অনুভব করে। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহারা মনে করে পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করিলে লোকেরা হয়ত এমন সন্দেহ করিতে পারে যে, এই লোকটি যুহ্দ ও তাক্ওয়া ত্যাগ করিয়া এখন দুনিয়াদারদের চালচলন অবলম্বন করিয়াছে।

অপর একটি শ্রেণী দুনিয়াদার ও দ্বীনদার এই উভয় পক্ষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে। অর্থাৎ দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ, উজীর, ব্যবসায়ী এবং ওলামা-মাশায়েখ ও সূফী সাধক ইত্যাদি সকলের নিকটই সম্মান পাইতে চাহে। এই শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা বড় সমস্যায় থাকে। কারণ, উত্তম পোশাক পরিধান করিলে সুফীগণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করে; আবার তালিযুক্ত সাধারণ পোশাক পরিধান করিলে রাজা-বাদশাহ ও বিত্তবানদের নজরে হেয় হইতে হয়। অথচ তাহারা কোন পক্ষের নিকটই নিজেদের মান ক্ষুণ্ন হইতে দিতে চাহে না। এই কারণে তাহারা মিহি জুব্বা এবং উন্নত মানের রঙ্গীন তালিযুক্ত লেবাস পরিধান করে। অর্থাৎ দৃশ্যতঃ তাহাদের পোশাক সাধারণ মনে হইলেও অনেক সময় মূল্যমানে তাহা বিত্তবানদের পোশাক হইতেও দামী হয়। তাহাদের পোশাকের রং এবং উহার ধরন-ধারণ আল্লাহওয়ালাদের পোশাকের মত হয়। অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকেরা দ্বীনদার ও দুনিয়াদার এই উভয় শ্রেণীর নিকটই এক রকম গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয় হইতে চাহে। এই শ্রেণীর লোকদিগকে যদি জোরপূর্বক মোটা ও ময়লা বস্ত্র পরিধান করাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে কিছুতেই তাহারা উহাতে সম্মত হয় না। এই ক্ষেত্রে তাহাদের আশংকা হয়- এইরূপ পোশাক পরিধান করিলে রাজা-বাদশাহ ও বিত্তবানদের নজরে তাহারা হীন ও তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইবে। অনুরূপভাবে তাহারা রেশমী ও মূল্যবান কাপড়ও পরিধান করিতে চাহে না। কেননা, তাহারা মনে করে, এইরূপ কাপড় পরিধান করিলে লোকেরা বলিবে, ইহারা বুজুর্গানেদ্বীনের তরীকা ও পন্থা ত্যাগ করিয়াছে।

সারকথা হইল, এই ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণীই যেই লেবাস ও পোশাককে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতির জন্য সহায়ক মনে করে, উহা হইতে নিম্নস্তর বা উচ্চস্তরের লেবাস পরিধান করিতে সম্মত হয় না। সেই লেবাস মোবাহ হইলেও না । অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দ্বীনদার লোকেরা এইভাবেই রিয়া করে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদারগণ উন্নত ও দামী পোশাক, মূল্যবান চাদর, দামী পাগড়ী ও জুব্বা, উন্নত সওয়ারী ও বিলাস সামগ্রীর মাধ্যমে রিয়া করে। অর্থাৎ এই দুনিয়াদারগণ ঘরের ভিতর সাধারণ পোশাক পরিধান করে বটে কিন্তু

বাহিরে যাওয়ার সময় দামী পোশাকে সাজগোজ করিয়া বাহির হয় যেন লোকেরা তাহাদিগকে বিত্তবান মনে করে।

কথার মাধ্যমে রিয়া

রিয়ার তৃতীয় প্রকার হইল 'কথা'। অর্থাৎ দ্বীনদার লোকেরা কথার মাধ্যমে রিয়া করে। উহার পদ্ধতি হইল– মানুষকে ওয়াজ-নসীহত করিয়া বেড়ানো, জ্ঞান ও হেকমতের কথা বলা, সচরাচর কথাবার্তায় ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কতক হাদীস ও মহাজনদের উক্তি মুখস্থ করিয়া লওয়া এবং মানুষকে শোনাইবার জন্য বুজুর্গানেদ্বীনের কিছু হালাত ইয়াদ করিয়া লওয়া– ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ জনসমাগমে জিকিরে লিপ্ত থাকে এবং অকারণেই ঠোঁট নাড়াইতে থাকে যেন লোকেরা মনে করে, লোকটি বড়ই নেক এবং সর্বদা আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন। ইহারা সাধারণ মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে এবং কাহাকেও কোন অন্যায় করিতে দেখিলে ভয়ানক অসন্তোষ প্রকাশ করে। এমনিভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় ক্ষীণ স্বরে কথা বলা এবং করুণ ও মিহি আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত করা যেন মানুষ মনে করে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং আখেরাতের ফিকিরে বড়ই পেরেশান। নির্দিষ্ট কতক হাদীস ইয়াদ করিয়া রাখা ও বড় বড় মোহাদ্দেসগণের সঙ্গে সখ্যতার দাবী করা। কেহ কোন হাদীস বর্ণনা করিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার উপর মন্তব্য করা কিংবা এইরূপ বলা যে, হাদীসটি যথার্থ বা ইহার বর্ণনায় ত্রুটি রহিয়াছে। অর্থাৎ এইরূপ মন্তব্যের ফলে যেন মানুষ মনে করে যে, হাদীস বিষয়ে লোকটির অগাধ জ্ঞান রহিয়াছে। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য দীর্ঘ বক্তব্যের অবতারণা করা এবং নিজের এলেম ও বিদ্যা-বুদ্ধি জাহির করার জন্য কথায় কথায় কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া।

কথার মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে রিয়া করার আরো অসংখ্য অবস্থা রহিয়াছে। এখানে নমুনা হিসাবে উহার কতক অবস্থা তুলিয়া ধরা হইল। এদিকে দুনিয়াদারগণ এই ক্ষেত্রে কিছু শের-বয়াত ও বুজুর্গানে দ্বীনের উক্তি মুখস্থ করিয়া রাখা এবং উহা বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষার অলংকার ও সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করার জন্য নির্দিষ্ট কতক বাক্য ও শব্দ মুখস্থ করিয়া সময়মত উহা ব্যবহার করা এবং মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাহাদের প্রতি কৃত্রিম সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করা ইত্যাদি।

আমলের মাধ্যমে রিয়া

রিয়ার চতুর্থ প্রকার হইল 'আমল'। অর্থাৎ দ্বীনদার ব্যক্তিগণ আমলের মাধ্যমে রিয়া করিয়া থাকে। উহার পদ্ধতি হইল– নামাজ দীর্ঘায়ীত করা। রুকু-সেজদায় বিলম্ব করা এবং স্থিরতা ও গাম্ভীর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুকাইয়া রাখা, হাত-পা সোজা করিয়া রাখা– ইত্যাদি।

অর্থাৎ যেইসব আমল দ্বারা নামাজে খুশু-খুজু প্রকাশ পায় সেইগুলি কৃত্রিমভাবে প্রকাশ করা। নামাজের মত রোজা, হজ্ব, জাকাত, জেহাদ, মানুষকে আহার করানো– ইত্যাদির মাধ্যমে রিয়া করা হয়। চলনে-বলনে শির নত করিয়া বিনয় প্রকাশের মাধ্যমেও রিয়া হইয়া থাকে। রিয়াকার ব্যক্তি নিজের কোন কাজে হয়ত দ্রুততার সহিত ধাবিত হয়, কিন্তু কোন দ্বীনদার মানুষের নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গতি শ্লথ করতঃ মাথা ঝুঁকাইয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। অতঃপর সেই দ্বীনদার ব্যক্তিটি দৃষ্টি আড়াল হইলে পুনরায় সেই আগের গতিতে চলিতে থাকে। পরে আবার দেখিয়া ফেলিলে সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ী চলন অবলম্বন করে। অর্থাৎ এই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে না; বরং মানুষকে দেখাইবার জন্যই বিনয় প্রকাশ করে, যেন লোকেরা তাহার চালচলন দেখিয়া মনে করে যে, বাস্তবিক লোকটি আল্লাহর নেক বান্দা বটে।

পক্ষান্তরে দুনিয়াদারগণ সদর্প পদচারণার মাধ্যমে রিয়া করে। তাহারা এই কারণে এইরূপ রিয়া করে যেন উহার ফলে মানুষের মাঝে তাহাদের ইজ্জত-সম্মান বড়ত্ব বৃদ্ধি পায়।

সাথী-সঙ্গীদের সঙ্গে রিয়া

রিয়ার পঞ্চম প্রকার হইল সাথী-সঙ্গী ও সাক্ষাতপ্রার্থীদের সঙ্গে রিয়া করা। দ্বীনদার লোকেরা নিজের সাথী সঙ্গী ও সাক্ষাতপ্রার্থীদের সঙ্গে রিয়া করিয়া থাকে। উদাহরণতঃ এইরূপ কামনা করা যে, আলেমগণ যেন আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে। উহার ফলে লোকেরা মনে করিবে, অমুক ব্যক্তি নিশ্চয়ই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং এই কারণেই আলেমগণ আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করে। কেহ কেহ আবার নিজের নিকট রাজা-বাদশাহ ও প্রশাসনের আমলাদের আগমন প্রত্যাশা করে। যেন সাধারণ লোকদের নিকট তাহার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অনেকে আবার কথায় কথায় ওলামা-মাশায়েখগণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যেন এই কথা প্রমাণ হয় যে, ইনি অসংখ্য আলেম ও পীর-বুজুর্গের সাহচর্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অর্থাৎ এই শ্রেণীর রিয়াকারগণ মাশায়েখ ও পীর-বুজুর্গের সান্নিধ্য লাভ এবং তাহাদের দ্বারা উপকৃত হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করে। বিশেষতঃ ধর্মীয় বিষয়ে যখন কোন বিতর্ক দেখা দেয়, তখন প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার সময় এইরূপ দাবী

করা হয় যে, আমি অমুক পীরকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, অমুক বুজুর্গকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি এবং অমুক অমুক দেশ সফর করিয়া অসংখ্য বুজুর্গের সোহবতের মাধ্যমে এই বিষয়ে আমার অগাধ জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা অর্জিত হইয়াছে।

রিয়ার নিষিদ্ধতা ও বৈধতা

উপরের সুদীর্ঘ আলোচনায় রিয়ার হাকীকত এবং উহার স্বরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। এখন আমরা পর্যালোচনা করিয়া দেখিব, শরীয়তের দৃষ্টিতে এই রিয়ার অবস্থান কি? এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যেই বিষয়টি আলোচনায় আসে তাহা হইল– রিয়া হারাম, মাকরূহ, না মোবাহ? কিংবা উহার বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে কি-না। এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের মতামত হইল– রিয়া অর্থাৎ সুনাম-সুখ্যাতির প্রত্যাশা এবাদতের মাধ্যমেও হইতে পারে, আবার এবাদত ছাড়া অন্য বিষয়ের মাধ্যমেও হইতে পারে। তো রিয়া যদি এবাদত ছাড়া অন্য বিষয়ের মাধ্যমে হয়, তবে উহার অবস্থান হইবে ধন-সম্পদের প্রত্যাশার মত। অর্থাৎ রিয়ার মাধ্যমে যদি শুধুই মানুষের অন্তরে সম্পদ ও মর্যাদা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা হয়, তবে উহা হারাম ও নিষিদ্ধ নহে– যেমন ধন-সম্পদের প্রত্যাশা হারাম নহে। কিন্তু সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে যেমন অবৈধ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তদ্রূপ সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের ক্ষেত্রেও অবৈধ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। তো মানবের জন্য নিজের একান্ত প্রয়োজনে আবশ্যক পরিমাণ সম্পদ আহরণ যেমন উত্তম; তদ্রূপ যৎসামান্য সুখ্যাতি ও মর্যাদা হাসিল করাও উত্তম। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিশরের বাদশাহকে বলিয়াছিলেন–

اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ، اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ *

অর্থঃ ইউসুফ বলিলঃ আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।" (সূরা ইউসুফঃ আয়াত ৫৫)

কিন্তু এখানে লক্ষ্য রাখিবার বিষয় হইল, ধন-সম্পদের আধিক্য যেমন মানুষকে অহংকারী ও বেপরওয়া করিয়া আল্লাহ পাকের জিকির ও পরকালের ফিকির হইতে গাফেল করিয়া দেয়; তদ্রূপ সুনাম-সুখ্যাতি ও মর্যাদার আধিক্যও মানুষকে গোমরাহ করিয়া দেয়। বরং ধন-সম্পদ ও মালের ফেৎনার মোকাবেলায় যশ-খ্যাতির ফেৎনা অধিক ক্ষতিকারক। সুতরাং আমরা যেমন এই কথা বলি না যে, অধিক সম্পদের মালিক হওয়া হারাম, তদ্রূপ বিপুল সংখ্যায় মানুষের অন্তরের মালিক হওয়াকেও আমরা হারাম বলি না। অবশ্য সম্পদ ও যশ-খ্যাতির আধিক্য যদি অবৈধ উপায়ে অর্জন করা হয়, তবে উহা ভিন্ন কথা

এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা বলিবঃ যশ-খ্যাতির আধিক্য প্রীতি যাবতীয় অনিষ্টের মূল– যেমন সম্পদের আধিক্য সর্ব প্রকার ফেৎনা ফাসাদের অন্যতম কারণ।

যশ-খ্যাতি ও সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট মানুষ অন্তর ও মুখের গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি নিজের চাহিদা ছাড়াই বিপুল যশ-খ্যাতি ও সুনাম-সুখ্যাতির মালিক হয় এবং উহা হইতে বঞ্চিত হইলেও ব্যাথিত না হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে তাহা ক্ষতিকারক নহে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তীতে ওলামায়ে দ্বীন যেই যশ-খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন, উহার সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তির যশ-খ্যাতির তুলনা হইতে পারে কি? কিন্তু এই সুনাম-সুখ্যাতি তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না এবং তাহারা উহার বিলুপ্তিতেও আশংকা বোধ করিতেন না। তো নিজেকে যশ-খ্যাতির অন্বেষায় নিরত রাখা যদিও দ্বীনের জন্য ক্ষতিকারক– তবুও উহাকে আমরা নিষিদ্ধ বলিতে পারিব না। এই কারণেই আমরা বলি– কোন ব্যক্তি যদি নিজের ঘর হইতে উত্তম পোশাক পরিধান করতঃ সাজ-সজ্জা করিয়া বাহির হয়, তবে ইহা রিয়া হইলেও হারাম নহে। কেননা, ইহা এবাদতের মধ্যে রিয়া নহে, বরং দুনিয়া সংক্রান্ত রিয়া। এই মূলনীতির আলোকে অপরাপর বিষয়ের উপরও কেয়াস করিয়া লওয়া যাইবে। ইহা হারাম না হওয়ার দলীল হিসাবে নিম্নের রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করা যাইতে পারে–

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের নিকট যাওয়ার সময় মটকার পানিতে দেখিয়া চুল ও পাগড়ী ঠিক করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও এইরূপ করেন? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে মোহাব্বত করেন, যেই ব্যক্তি নিজের ভাইদের নিকট যাওয়ার সময় পরিপাটি হইয়অ যায়। (ইবনে আ'দী)

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত আমলটি ছিল এবাদত। কেননা, তিনি মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, ন্যায় ও সত্যের আনুগতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা এবং উম্মতকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার কাজে আদিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তিনি যদি মানুষের নিকট সাদরে গ্রহণীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র না হইবেন, তবে মানুষ কেমন করিয়া তাঁহার আনুগত্য করিবে? এই কারণে তাঁহার বাহ্যিক অবস্থাও সৌম্য ও মনোরম হওয়া আবশ্যক ছিল, যেন মানুষের নজরে তিনি হীন না হন। কেননা, সাধারণ মানুষের নজর বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ তাহাদের নজর বাতেনী অবস্থা পর্যন্ত

পৌঁছাইতে সক্ষম হয় না। সুতরাং এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন মানুষ যদি জনসাধারণের নিন্দা ও হীন দৃষ্টি হইতে বাঁচিয়া থাকার উদ্দেশ্যে নিজের লেবাস-ছুরত দুরস্ত করিয়া চলে এবং মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা কামনা করে, তবে তাহার এই প্রত্যাশাকে মোবাহ বলা হইবে। কারণ প্রতিটি মানুষেরই নিন্দার পীড়ন হইতে বাঁচার এবং সকলের সঙ্গে সদ্ভাব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের সুফল ভোগ করার অধিকার আছে। মানুষের এই প্রত্যাশা অনেক সময় এবাদতের মধ্যে গণ্য হয়, আবার অনেক সময় তাহা নিন্দিতও হয়। ইহা নির্ভর করে মানুষের উদ্দেশ্য ও নিয়তের উপর। মানুষের উদ্দেশ্য ও নিয়ত যেইরূপ হইবে, সেই হিসাবেই উহার হুকুম আরোপিত হইবে। এই কারণেই আমরা বলি- কোন ব্যক্তি যদি একদল বিত্তবানের মধ্যে ছাওয়াবের নিয়ত ছাড়া কেবল 'দানবীর' খ্যাতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু সম্পদ ব্যয় করে, তবে উহা রিয়া হইবে বটে, কিন্তু হারাম হইবে না।

সদকা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জেহাদ ইত্যাদি এবাদতের মাধ্যমে রিয়াকারীগণ সাধারণত দুইটি অবস্থার শিকার হয়। প্রথমত তাহাদের আমলের উদ্দেশ্য শুধুই রিয়া হওয়া এবং উহার বিনিময়ে ছাওয়াবের প্রত্যাশী না হওয়া। এই শ্রেণীর লোকদের সমস্ত এবাদতই বরবাদ হয়। কেননা, মানুষের আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর। আর এই ক্ষেত্রে তাহারা এবাদতের নিয়ত করে না। এই কারণেই তাহারা ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হয়। এই ক্ষেত্রে তাহাদের পরিণতি এমন নহে যে, আমল বরবাদ হইয়া আমলের পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকিবে; বরং উদ্দেশ্য ও নিয়তের বিশুদ্ধতার অভাবে তাহারা গোনাহগারও হইবে বটে। গোনাহগার হওয়ার কারণ দুইটি। প্রথম কারণটি মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়। কেননা, উপরোক্ত আচরণের ফলে মানুষ তাহাকে আল্লাহ'র অনুগত ও মোখলেস বান্দা মনে করে। অথচ প্রকৃত অবস্থা উহার বিপরীত। এই অবস্থাটি হইল দ্বীনের সহিত সংশ্লিষ্ট। দুনিয়ার ক্ষেত্রেও মানুষকে প্রতারণা করা জায়েজ নহে। সুতরাং কোন মানুষ যদি এমন পদ্ধতিতে করজ আদায় করে যে, একজন সাধারণ দর্শক উহাকে সদকা বা দান মনে করে, তবে ইহাতেও গোনাহ হইবে। কেননা, এইভাবে করজ আদায় করিয়া দর্শককে প্রতারিত করার মাধ্যমে মানুষের নিকট সম্মান প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা হইতেছে।

দ্বিতীয় কারণটি আল্লাহর সহিত সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিতে সে যেন আল্লাহর এবাদত করিতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার উদ্দেশ্য হয় গায়রুল্লাহ। ইহা যেন সুস্পষ্টরূপেই আল্লাহর সঙ্গে তামাশা করার নামান্তর। এই প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেনঃ মানুষ যখন রিয়া করে, তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে ডাকিয়া বলেনঃ দেখ, বান্দা আমার সঙ্গে মজাক করিতেছে।

উপরোক্ত অবস্থার উদাহরণ যেন এইরূপঃ এক ব্যক্তি সমস্ত দিন করজোড়ে বাদশাহর খেদমতে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহার এই 'করজোড় দণ্ডায়মান' বাদশাহর ভয় কিংবা আজমতের কারণে নহে; বরং এইভাবে বাদশাহর নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার যুবতী বাঁদীর রূপ দেখাই তাহার মূল উদ্দেশ্য। তো এই আচরণটিকে বাদশাহর সঙ্গে তামাশা করা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? কেননা, এই ব্যক্তি বাদশাহর খেদমত কিংবা তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়ত করে নাই। বরং বাদশাহর সুন্দরী বাঁদীর রূপ দর্শনই ছিল তাহার উদ্দেশ্য।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, ইহা অপেক্ষা জঘন্য কর্ম আর কি হইতে পারে যে, একজন মানুষ আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যের ছুরতে এমন একজন মানুষের জন্য রিয়া করিতেছে- যেই মানুষ তাহার কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করিতে পারে না? এইরূপ রিয়াকার ব্যক্তি সম্পর্কে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে যেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে এমন ধারণা করিতেছে যে, তাহার দ্বারাই আমার উদ্দেশ্য পূরণ হইবে কিংবা আমার জন্য এই ব্যক্তির নৈকট্য আল্লাহর নৈকট্য হইতেও কল্যাণকর হইবে। এই কারণেই তো সে আল্লাহর উপর সেই ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দিতেছে এবং তাহাকেই নিজের এবাদতের লক্ষ্য স্থির করিতেছে। সুতরাং আমরা বলিব- গোলামকে মনিবের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মত জঘন্য তামাশা আর কি হইতে পারে? এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে 'শিরকে আসগর' বা ছোট শিরক আখ্যা দিয়াছেন।

রিয়া কখনো গোনাহমুক্ত নহে। তবে শ্রেণী বিভক্ত রিয়ার একটি অপরটির তুলনায় গুরুতর বটে। কোন রিয়ার গোনাহ হয়ত খুবই কঠিন, আবার কোনটির গোনাহ হয়ত মামুলী। রিয়ার মধ্যে যদি অন্য কোন গোনাহ নাও থাকে, তবুও গায়রুল্লাহর জন্য রুকু-সেজদাহ করা- ইহাই কি কোন কম অপরাধ? বস্তুতঃ রিয়া বা লোকদেখানো এবাদত একটি চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং যেই ব্যক্তিকে শয়তান প্রতারণার জালে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, কেবল তাহার পক্ষেই রিয়া করা সম্ভব। শয়তান তাহার অন্তরে এমন বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে যে, মানুষই তাহার লাভ-ক্ষতির মালিক, মানুষই তাহার হায়াত-মউত ও রিজিকের মালিক এবং আল্লাহ অপেক্ষা মানুষের ক্ষমতাই অধিক (নাউজুবিল্লাহ)। এই কারণেই সে নিজের দৃষ্টি আল্লাহর দিক হইতে ফিরাইয়া সেই ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ করিয়াছে। আল্লাহ পাক যদি ইহকাল-পরকালে রিয়াকারের দায়িত্ব সেই বান্দার হাতেই ছাড়িয়া দেন, তবে বান্দা সেই রিয়াকারের বড় কোন আমলের মোকাবেলায় কোন সাধারণ বিনিময় দিতেও সক্ষম হইবে না। বান্দা তো নিজের লাভ-লোকসানেরই ফায়সালা করিতে পারে না। সুতরাং সে আবার অপরের লাভ-লোকসানে কেমন করিয়া হস্তক্ষেপ করিবে? আর দুনিয়াতেই যখন তাহার এই অবস্থা সেই বান্দা

আখেরাতের ব্যাপারে কি করিতে পারিবে? অথচ আখেরাতের অবস্থা হইল–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ، وَ لَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا *

অর্থঃ "হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এমন এক দিবসকে যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসিবে না এবং পুত্রও তাহার পিতার কোন উপকার করিতে পারিবে না।" (সূরা লোকমানঃ আয়াত ৩৩)

পরকালে তো আল্লাহর নবীগণও ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! বলিতে থাকিবেন। রিয়াকারের সব চাইতে বড় বোকামী হইল, সে পরকালের ছাওয়াব এবং আল্লাহর নৈকট্যকে দুনিয়ার তুচ্ছ লোভের বিনিময়ে মানুষের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়।

নিম্নে আমরা রিয়ার রোকন এবং উহার স্তর প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। রিয়ার রোকন তিনটি–

১. রিয়া,
২. যাহা দ্বারা রিয়া করা হয়,
৩. যাহার জন্য রিয়া করা হয়।

প্রথম রোকন

প্রথম রোকন হইল রিয়া। রিয়ার মধ্যে দুইটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থা অবশ্য বিদ্যমান থাকিবে। অর্থাৎ এই রিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর এবাদত ও ছাওয়াবের নিয়ত মোটেই থাকিবে না। কিংবা ছাওয়াবের নিয়ত থাকিবে বটে, তবে এই নিয়ত শক্তিশালীও হইতে পারে আবার দুর্বলও হইতে পারে। অথবা রিয়া ও ছাওয়াবের ইচ্ছা বরাবর হইতে পারে। এই হিসাবে উহা চারিটি স্তরে বিভক্ত হইল। নিম্নে আমরা পৃথক শিরোনামে উহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

প্রথম স্তর

রিয়ার যাবতীয় স্তর সমূহের মধ্যে ইহা সর্বাধিক গুরুতর। অর্থাৎ ছাওয়াবের নিয়ত মোটেই না থাকা। যেমন এক ব্যক্তি মানুষের সামনে নামাজ পড়ে কিন্তু একাকী হইলে নামাজ পড়ে না। আবার কোন কোন সময় অজু ছাড়াই মানুষের সঙ্গে দাঁড়াইয়া যায়। এইরূপ ব্যক্তির নিয়ত থাকে শুধুই রিয়া এবং উহার ফলেই সে আল্লাহর গজবের শিকার হয়। এই হুকুম এমন ব্যক্তির জন্যও; যেই ব্যক্তি লোকনিন্দার ভয়ে সম্পদের জাকাত আদায় করে এবং ছাওয়াবেরও আশা করে।

দ্বিতীয় স্তর

রিয়ার দ্বিতীয় স্তর হইল, ছাওয়াবের ইচ্ছা থাকিবে বটে কিন্তু তাহা খুবই

দুর্বল হইবে। অর্থাৎ এই ব্যক্তি যদি একা থাকে তবে এই এবাদত করিবে না। কেননা, তাহার ছাওয়াব প্রাপ্তির ইচ্ছা এমন শক্তিশালী নহে, যার কারণে সেই আমলটি বাস্তবে রূপ লাভ করিতে পারে। অবশ্য ছাওয়াবের ইচ্ছা না থাকিলেও রিয়ার কারণেই সেই আমলটি অবশ্যই করিত। এই স্তরটি প্রথম স্তরের কাছাকাছি। এইরূপ ইচ্ছা থাকা না থাকা বরাবর। এই ব্যক্তিও আল্লাহর গজবের শিকার হইবে।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তর হইল, রিয়ার ইচ্ছা এবং ছাওয়াবের ইচ্ছা উভয়টিই সমান সমান হওয়া। এই দুইটি ইচ্ছা একত্রিত হইলে সে আমল করে এবং এই দুইটির কোন একটি অনুপস্থিত থাকিলে আমল করে না। এইরূপ ব্যক্তির অবস্থা হইল, সে যেই পরিমাণ গড়ে, সেই পরিমাণই নষ্ট করে। ফলে আশা করা যায়– এইরূপ ব্যক্তি ছাওয়াবও পাইবে না এবং আজাবেরও শিকার হইবে না। কিংবা যেই পরিমাণ ছাওয়াব হইবে সেই পরিমাণই আজাব হইবে। হাদীসের বাহ্যিক বিবরণ দ্বারা জানা যায়– এইরূপ ব্যক্তিও আল্লাহর আজাব হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে না।

চতুর্থ স্তর

চতুর্থ স্তর হইল, ছাওয়াবের ইচ্ছা প্রবল ও রিয়ার ইচ্ছা দুর্বল হওয়া। সুতরাং মানুষ তাহার আমল সম্পর্কে জানিতে না পারিলেও সে আমল বর্জন করে না। কিংবা এবাদতের ইচ্ছাই তাহাকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না। আমাদের ধারণায় এইরূপ ব্যক্তি মূল ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না বটে, কিন্তু ছাওয়াব কিছুটা কম হইবে। অথবা রিয়া পরিমাণ আজাব হইবে এবং ছাওয়াবের ইচ্ছা পরিমাণ ছাওয়াব হইবে।

দ্বিতীয় রোকন

দ্বিতীয় রোকন হইল– যাহা দ্বারা রিয়া করা হয়। মানুষ যেই দুইটি বিষয় দ্বারা রিয়া করে, তাহা হইল আনুগত্য ও এবাদত। এই হিসাবে রিয়ার দুইটি স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ মূল এবাদত দ্বারা রিয়া করা এবং দ্বিতীয়তঃ এবাদতের গুণ দ্বারা রিয়া করা। প্রথম স্তরটি খুবই মারাত্মক। এই স্তরটির তিনটি অবস্থা রহিয়াছে।

প্রথম অবস্থা

প্রথম অবস্থা হইল, মূল ঈমান দ্বারাই রিয়া করা। এই রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যেই ব্যক্তি ঈমান দ্বারা রিয়া করে, সে প্রকাশ্য কাফের। এইরূপ ব্যক্তি অনন্তকাল জাহান্নামের আজাবে থাকিবে। এইরূপ রিয়াকার হইল সেই ব্যক্তি,

যে মুখে কালেমা পড়ে বটে, কিন্তু অন্তরে উহাকে মিথ্যা মনে করে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে সে নিজেকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু তাহার অন্তর থাকে ইমানশূন্য। এইরূপ রিয়াকার সম্পর্কে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ، وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ، وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ *

অর্থঃ মোনাফেকেরা আপনার নিকট আসিয়া বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মোনাফেকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"

(সূরা মোনাফেকুনঃ আয়াত ১)

অর্থাৎ তাহাদের মুখের কথা অন্তরের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ، وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ * وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ، وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ *

অর্থঃ "আর এমন কিছু লোক রহিয়াছে যাহাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করিবে। আর তাহারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন ফিরিয়া যায় তখন চেষ্টা করে যাহাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করিতে পারে এবং (কাহারও) শস্যক্ষেত্রও প্রাণনাশ করিতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।" (সূরা বাক্বারাঃ আয়াত ২০৪ – ২০৫)

অন্য আয়াতে আছে–

وَ اِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ اِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ *

অর্থঃ "অথচ তাহারা যখন তোমাদের সঙ্গে আসিয়া মিশে, বলে– 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' পক্ষান্তরে তাহারা যখন পৃথক হইয়া যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াইতে থাকে।" (সূরা আল-ইমরানঃ আয়াত ১১৯)

আরো এরশাদ হইয়াছে–

يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا * مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ *

অর্থঃ "শুধু লোকদেখানোর জন্য। আর তাহারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। ইহারা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নহে, সেদিকেও নহে।"

(সূরা নিসাঃ আয়াত ১৪২ – ১০৪)

পবিত্র কোরআনে মোনাফেকদের বিবরণ সম্বলিত এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে। এখানে নমুনা হিসাবে উহার কয়েকটি উল্লেখ করা হইল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মোনাফেকদের তৎপরতা অনেক বেশী ছিল। কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাহারা নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিত। কিন্তু তাহাদের অন্তর থাকিত কুফরীতে পরিপূর্ণ। বর্তমান যুগে এই রূপ মোনাফেকদের সংখ্যা কম বটে। তবে এখনো এক শ্রেণীর লোক মনে মনে জান্নাত-জাহান্নাম ও কেয়ামত ইত্যাদিকে অস্বীকার করে এবং মুখে রিয়াকার ও মোনাফেক। ইহারাও অনন্তকাল জাহান্নামে থাকিবে। কেননা, ইহারা প্রকাশ্য কাফেরদের চাইতেও জঘন্য।

দ্বিতীয় অবস্থা

দ্বিতীয় অবস্থা হইল মূল ঈমানকে স্বীকার করার পাশাপাশি এবাদতের মাধ্যমে রিয়া করা। ইহাও কঠিন গোনাহের কাজ বটে, তবে প্রথম অবস্থার তুলনায় কিছুটা হাল্কা। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি হয়ত নামাজ পড়ায় অভ্যস্থ নহে। কিন্তু লোকজনের সঙ্গে অবস্থানকালে সকলে যখন নামাজে রওনা হইল, তখন সেও তাহাদের সঙ্গে নামাজে গিয়া হাজির হইল। অথচ তাহার অবস্থা হইল, যদি লোক নিন্দার ভয় না হইত, তবে সে কিছুতেই নামাজে যাইত না। অনুরূপভাবে নিজের ইচ্ছা ও স্বভাবের বিরুদ্ধে আত্মীয়দের সঙ্গে ভাল ব্যবহার, মাতাপিতার আনুগত্য কিংবা জেহাদ ও হজ্বে গমন করিল। মানুষের নিন্দা ও সমালোচনার আশংকা না হইলে সে এইসবের কিছুই করিত না। সুতরাং তাহার এইসব আমল সুস্পষ্ট রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে এইসব রিয়ার কারণে তাহার মূল ঈমান নষ্ট হইবে না। কেননা, সে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহাকেও সেজদা করিতে বলিলে সে কিছুতেই উহাতে সম্মত হইবে না। অবশ্য অলসতার কারণে সে এবাদতে অবহেলা করে এবং মানুষকে দেখাইয়া এবাদত করিতে পারিলে আনন্দিত হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহর নিকট সম্মানিত হওয়ার তুলনায় মানুষের নিকট সম্মানপ্রাপ্তির বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং আল্লাহর আজাবের তুলনায় মানুষের নিন্দাকে বেশী ভয় করে। আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ছাওয়াব ও বিনিময় প্রাপ্তি অপেক্ষা মানুষের প্রশংসা প্রাপ্তির অধিক প্রত্যাশী হয়। এইরূপ মনোভাব চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই শ্রেণীর লোকদের মূল ঈমান বহাল থাকিলেও তাহারা নির্ঘাত আল্লাহর আজাবের শিকার হইবে।

তৃতীয় অবস্থা

তৃতীয় আরেকটি অবস্থা হইল, এই শ্রেণীর লোকেরা ঈমান ও ফরজ এবাদত দ্বারা রিয়া করে না বটে, তবে নফল ও মোস্তাহাব এবাদত দ্বারা রিয়া করে– যাহা বর্জন করিলে কোন গোনাহ হয় না। অর্থাৎ সম্মুখে কোন লোকজন না থাকিলে ছাওয়াবের আশায় এবাদত করে না বটে, কিন্তু লোকজন থাকিলে তাহাদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নফল এবাদত করে। যেমন– জামায়াতে শরীক হওয়া, রোগীর সেবা করা, জানাজায় শরীক হওয়া, মুরদারকে গোসল দেওয়া– ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ, ইয়াওমে আশুরা-আরাফা এবং বৃহস্পতিবার ও সোমবারের নফল রোজা রাখা– ইত্যাদি। রিয়াকার অনেক সময় এইসব এবাদত লোক নিন্দার ভয় ও মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যেও করিয়া থাকে। অথচ আল্লাহ পাক ভাল করিয়াই জানেন যে, একাকী হইলে এই শ্রেণীর লোকেরা ফরজ এবাদতের বেশী আর কিছুই করিত না। এই শ্রেণীটি পূর্ববর্তী দুইটি শ্রেণীর তুলনায় কম মন্দ।

এবাদতের গুণ দ্বারা রিয়া করা

এবাদতের গুণ দ্বারা রিয়া করার ক্ষেত্রেও উহার তিনটি স্তর রহিয়াছে–

প্রথম স্তর

উহার প্রথম স্তর হইল, এমন কাজে রিয়া করা যাহা বর্জন করিলে এবাদতের মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়। যেমন– এক ব্যক্তি একাকী নামাজ পড়ার সময় রুকু-সেজদা, কেয়াম-জলসা ইত্যাদি সবই দ্রুত সম্পন্ন করে। কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলা মাত্র সবকিছু ঠিক ঠিকভাবে আদায় করিতে শুরু করে। এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ সে যেন আল্লাহ পাককে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে। অর্থাৎ– আল্লাহ পাক যে তাহার গোপন আমল সম্পর্কেও সম্যক পরিজ্ঞাত, এই বিষয়টিকে যেন সে কিছুমাত্র পরওয়া করিতেছে না। অথচ মানুষ তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেই আমলের প্রতি যথাযথ মনোযোগী হইতেছে।

এক কথায় সে যেন মানুষকে পরওয়া করিতেছে কিন্তু আল্লাহকে পরওয়া করিতেছে না। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ– এক ব্যক্তি হয়ত কাহারো সম্মুখে তাকিয়ায় হেলান দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পর সম্মুখের সেই লোকটির এক গোলাম হঠাৎ তথায় আসিয়া হাজির হওয়া মাত্র সেই লোকটি সোজা হইয়া বসিয়া পা গুটাইয়া লইল। এখন লোকটির এই আচরণ দেখিয়া সকলেই বলিবে যে, লোকটি একজন মনিবের উপর তাহার গোলামকে প্রাধান্য দিয়াছে। অনুরূপভাবে একাকী জাকাত দেওয়ার সময় ময়লা ও ছেঁড়া নোট দ্বারা জাকাত আদায় করা, আর লোক সমাগমে চকচকে নোট দ্বারা জাকাত আদায়

করা– যেন মানুষ তাহাকে খারাপ বলিতে না পারে কিংবা রোজার হালাতে মানুষের নিন্দার ভয়ে গীবত-শেকায়েত বর্জন করিয়া চলা ইত্যাদি কর্মসমূহ সুস্পষ্ট রিয়া এবং ইহা নিষিদ্ধ। কেননা, এই ক্ষেত্রেও স্রষ্টার উপর সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এক্ষণে যদি কেহ বলে যে, আমি মানুষকে গীবত হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করি। অর্থাৎ তাহারা যদি আমাকে সাধারণভাবে রুকু-সেজদা করিতে এবং সংক্ষিপ্ত কেয়াম-কেরাত করিতে দেখে, তবে আমার সমালোচনা ও গীবত করিতে শুরু করিবে; সুতরাং এই বিষয়ে তাহারা যেন আমার গীবত ও সমালোচনা করার সুযোগ না পায়, এই উদ্দেশ্যেই আমি তাহাদের সম্মুখে উত্তমরূপে নামাজ আদায় করি। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে অপরাপর মানুষকে একটি জঘন্য পাপ হইতে রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য, তবে এই বক্তব্যের জবাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা বলিব– তোমার এই ধারণা শয়তানের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে। তুমি বরং একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, এই ক্ষেত্রে তোমার ক্ষতির পরিমাণ তাহাদের উপকারের তুলনায় অনেক বেশী। কেননা, নামাজ হইল আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উসিলা এবং পরকালে উহা তোমার উপকারে আসিবে। এখন তুমি যদি এই নামাজে অবহেলা কর, তবে তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভে ব্যর্থ হইবে এবং পরকালের কঠিন দিনে উহা তোমার কোন উপকারে আসিবে না।

পক্ষান্তরে তুমি যদি দ্বীনী আবেগ ও ধর্মীয় মনোভাবের কারণে এইরূপ করিয়া থাক, তবে তো তোমার নিজের ব্যাপারেই অধিক যত্নবান হওয়া আবশ্যক। কেননা, তুমি যদি নিজের তুলনায় অপরের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি অধিক মনোযোগী হও, তবে তোমার উদাহরণ যেন এইরূপঃ এক ব্যক্তি বাদশাহর পক্ষ হইতে নগদ অর্থ-সম্পদ পাওয়ার আশায় বাদশাহর খেদমতে একটি অন্ধ বাঁদী পেশ করার ইচ্ছা করিল। বাঁদীটি একাধারে অন্ধ, লেংড়া ও কুৎসিতও বটে। তাহার এই গর্হিত আচরণে বাদশাহ যে ক্রুদ্ধ হইবেন– এই বিষয়টিকে সে কিছুমাত্র আমলে আনিতেছে না। বরং সে হয়ত আশংকা করিতেছে, বাদশাহর উজীর ও গোলামরা যদি দেখিতে পায় যে, বাদশাহকে এমন একটি কুৎসিত বাঁদী উপঢৌকন দেওয়া হইতেছে, তবে তাহারা হয়ত এই বিষয়ে তাহার নিন্দা করিবে। অথচ তাহার উচিৎ ছিল, উজীর গোলামদের সমালোচনার পরওয়া না করিয়া বাদশাহর অসন্তোষের কথা চিন্তা করা।

যাহাই হউক, উপরে যেই রিয়ার কথা আলোচনা করা হইল, উহার দুইটি অবস্থা হইতে পারে। প্রথমতঃ রিয়ার মাধ্যমে শুধুই মানুষের প্রশংসা ও মর্যাদা

প্রত্যাশা করা। ইহা সুস্পষ্টরূপেই হারাম। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ কল্পনা করা যে, আমি যদি মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে ভালভাবে রুকু-সেজদা আদায় করিব, তবে আমার এই আমলে এখলাস থাকিবে না। আর যদি তাড়াহুড়া করিয়া নামাজ আদায় করি, তবে আমার এই নামাজ আল্লাহ পাকের নিকট ত্রুটিপূর্ণরূপে গণ্য হইবে। তদুপরি এই নামাজ মানুষের নিকট নিন্দনীয় হওয়ার কারণে আমাকে মানসিক পীড়নের শিকার হইতে হইবে। এখন আমি যদি ভালভাবে নামাজ আদায় করি, তবুও তো এই নামাজের ত্রুটি দূর হইতেছে না। কেননা, আমার এই নামাজে এখলাস অবর্তমান। অবশ্য এইরূপ নামাজের ফলে মানুষের নিন্দা ও গীবতের পীড়ন হইতে মুক্ত থাকা যাইবে। এই অবস্থাটি এতদ্ অপেক্ষা উত্তম যে, আমি রুকু-সেজদা ভালভাবে আদায় না করিয়া ছাওয়াব হইতেও বঞ্চিত থাকিব এবং মানুষের নিন্দাও সহ্য করিব। এই সূক্ষ্ম অবস্থাটি বিবেচ্য বিষয় বটে।

এই ক্ষেত্রে সঠিক মতামত হইল, নামাজী ব্যক্তির কর্তব্য হইল, পরিপূর্ণ এখলাসের সহিত নামাজের রুকু-সেজদাগুলি উত্তমরূপে আদায় করিবে। ইহা ওয়াজিব। যদি এখলাসের সহিত এইরূপ নামাজ আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে একাকী নামাজ পড়ার সময় এইরূপ অভ্যাস করার চেষ্টা করিবে। কেননা, ইহা কখনো সঙ্গত হইতে পারে না যে, আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও এবাদতের মাধ্যমে রিয়া করিয়া মানুষকে নিন্দা ও গীবত হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিবে। এইরূপ করিলে তাহা আল্লাহ পাকের সঙ্গে উপহাস করা হইবে– যাহা কবীরা গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় স্তর

দ্বিতীয় স্তর হইল, এমন কাজের মধ্যে রিয়া করা যাহা না করিলে এবাদতের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি আসে না। তবে এই কথা সত্য যে, ঐ কর্মটি এবাদতের মধ্যে পূর্ণতা আনয়ন করে।

যেমনঃ রুকু-সেজদা ও কেয়ামে বিলম্ব করা, যথা নিয়মে হস্তদ্বয় উত্তোলন করা, তাকবীরে উলার জন্য আগে আগে মসজিদে যাওয়া, কেরাত সাধারণ নিয়মের চাইতে একটু দীর্ঘ করা, রমজানের রোজার সময় সকল হইতে পৃথক হইয়া একাকী থাকা এবং অধিক সময় নীরব থাকা, উত্তম মাল দ্বারা জাকাত দেওয়া– ইত্যাদি। অর্থাৎ লোকটি যদি একাকী হইত, তবে এইভাবে আমল করিত না। ইহা তাহার শুধুই লোকদেখানো আমল।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তর হইল এমন আমল দ্বারা রিয়া করা যাহা নফল আমলের মধ্যেও গণ্য নহে। যেমন– নামাজের জন্য সকলের আগে মসজিদে গমন করা, প্রথম

কাতারে শামিল হওয়া, ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানো– ইত্যাদি অর্থাৎ একাকী হইলে সে এইসব আমল করে না।

তৃতীয় রোকন

তৃতীয় রোকন হইল, যেই উদ্দেশ্যে রিয়া করা হয়। যেই ব্যক্তি রিয়া করে, তাহার এই রিয়ার পিছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই নিহিত থাকে। কখনো সে মাল-দৌলত ও ধনসম্পদের জন্য রিয়া করে, আবার কখনো তাহার উদ্দেশ্য হয়, যশ-খ্যাতি ও সুনাম অর্জন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে এই রিয়ার পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকিতে পারে। এই অবস্থাটিও তিনটি স্তরে বিভক্ত।

প্রথম স্তর

রিয়ার যাবতীয় স্তর সমূহের মধ্যে এই স্তরটি সবচাইতে মারাত্মক। অর্থাৎ গোনাহের জন্য রিয়া করা। যেমন– সন্দেহযুক্ত মাল খাওয়ার জন্য এবাদতের মাধ্যমে রিয়া করা এবং অধিকাংশ সময় নফল এবাদত দ্বারা নিজের বুজুর্গী জাহির করা। এইসব আমলের পিছনে তাহার উদ্দেশ্য থাকে যেন লোকেরা তাহাকে আমানতদার মনে করিয়া বিচারকার্য, ওয়াকফ সম্পত্তি, ওসীয়ত পূরণ এবং এতীমের সম্পদের জিম্মাদারী তাহার হাতে সোপর্দ করে। আর এই সুযোগে সে উহা হইতে আত্মসাৎ করিতে পারে। অনুরূপভাবে জাকাত-সদকার সম্পদ বন্টনের দায়িত্ব, সাধারণ মানুষের আমানতের দায়িত্ব এবং হজ্বের সফরে কাফেলার সাথীদের টাকা-পয়সার দায়িত্ব যেন তাহার হাতে দেওয়া হয় এবং সে যেন উহা হইতে নিজের ইচ্ছামত খরচ করিতে পারে।

কতক লোক সূফীগণের লেবাস পরিধান করিয়া আল্লাহর ওলীদের রূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় তাহারা ওয়াজ-নসীহত ও দ্বীনের কথা বলিয়া বেড়ায়। আর মনে মনে উদ্দেশ্য থাকে এই প্রক্রিয়ায় কোন নারী বা কিশোরের মন আকর্ষণ করিতে পারিলে তাহার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা। আবার কতক লোক ওয়াজ ও কেরাতের মাহ্ফিলে শরীক হয়। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে করা হয় যেন তাহারা দ্বীনের কথা ও কালামে পাকের তেলাওয়াত শোনার জন্যই তথায় হাজির হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে– মজলিসে আগত যুবতী নারী ও কম বয়সী কিশোরদের রূপ দর্শন করা। এই সকল লোক আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর রিয়াকার। কেননা, তাহারা আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও এবাদতকে গোনাহের কাজের মাধ্যম বানাইয়াছে।

উপরোক্ত শ্রেণীর কাছাকাছি আরেকটি দল হইল, যাহারা কোন গর্হিত কর্মে সংশ্লিষ্ট হইয়া অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার পর এমন কামনা করে যেন সেই অপরাধ হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। যেমন– এক ব্যক্তি আমানতের

খেয়ানত করার পর লোকেরা যখন তাহাকে "খেয়ানতকারী" হিসাবে আখ্যা দিল, তখন সে নিজের সম্পদ হইতে প্রচুর পরিমাণে দান করিতে শুরু করিল। যেন মানুষ তাহার দানশীলতা দেখিয়া এই কথা বলিতে বাধ্য হয় যে, যেই ব্যক্তি নিজের সম্পদ হইতে এমন বিপুল পরিমাণে মানুষকে দান করে, সেই ব্যক্তি মানুষের আমানতের সামান্য কয়েকটি টাকা আত্মসাৎ করিবে, ইহা কখনো বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় স্তর

দ্বিতীয় স্তর হইল, রিয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার বৈধ স্বাদ-সম্ভোগ উদ্দেশ্য হওয়া। যেমন ধন-সম্পদ হাসিল কিংবা কোন সুন্দরী ও সদবংশীয়া নারীকে বিবাহ করার বাসনা- ইত্যাদি। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি ক্রমাগত হা-হুতাশ, ওয়াজ-নসীহত ও জিকির-আজকারে মশগুল হওয়া যেন তাহার এই অবস্থা দেখিয়া মানুষ তাহাকে মাল দেয় কিংবা প্রার্থিত নারীটি যেন তাহার সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হয়। অনুরূপভাবে কোন আলেম ও আবেদের কন্যাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে নিজের এলমী ও আমলী যোগ্যতা প্রকাশ করা যেন উহার ফলে সেই আলেম তাহার কন্যা সমর্পনে সম্মত হন। এইরূপ রিয়া হারাম। কেননা, এই ক্ষেত্রে রিয়াকার আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা পার্থিব সম্পদ প্রার্থনা করিতেছে। তবে এই স্তরটি প্রথমোক্ত স্তর হইতে কম মন্দ। কেননা, এখানে প্রার্থিত বস্তুটি সত্বাগতভাবে বৈধ। যদি প্রার্থিত বস্তুটি হারাম হইত তবে তো উহার অবস্থা আরো গুরুতর হইত।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তর হইল, এই রিয়ার পিছনে কোন আরাম আয়েশ, ধনসম্পদ অর্জন কিংবা বিবাহ-শাদী ইত্যাদি কিছুই উদ্দেশ্য না হওয়া। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কেবল এই আশংকায় এবাদতের প্রদর্শনী ঘটায় যে, সে যদি এবাদত না করে, তবে লোকেরা তাহাকে হীন দৃষ্টিতে দেখিবে এবং তাহাকে আবেদ ও জাহেদদের মধ্যে গণ্য করা হইবে না। বরং তাহাকে একজন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত মানুষ মনে করিয়া তুচ্ছ নজরে দেখা হইবে। যেমন এক ব্যক্তি হয়ত নিজের অভ্যাস অনুযায়ী দ্রুত পথ চলিতেছে। কিন্তু যখনই সে টের পাইল যে, মানুষ তাহাকে অবলোকন করিতেছে, তখনই হাঁটার ধরন পরিবর্তন করিয়া ধীর-স্থিরভাবে চলিতে শুরু করিল যেন মানুষ তাহাকে ভাবগম্ভির ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনে করিতে পারে। অনুরূপভাবে নিন্দার ভয়ে হাসি-মজাক ও আনন্দ-ফুর্তির স্থলে "আস্তাগফেরুল্লাহ" পড়া, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করা, পেরেশানী জাহির করা এবং এইরূপ বলা যে, হায়! মানুষ নিজের ব্যাপারে কেমন গাফেল হইয়া গিয়াছে। অথচ আল্লাহ পাক এই ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল করিয়াই জানেন যে, এই ব্যক্তি যদি

একাকী হইত, তবে এইরূপ হাসি-মজাককে কিছুমাত্র দোষণীয় মনে করিত না। তাহার আশংকা কেবল উহাতে শরীক হইলে মানুষের নজরে তাহাকে হাল্কা হইতে হইবে।

অনুরূপভাবে সেই সকল ব্যক্তিও উপরোক্ত শ্রেণীভুক্ত, যাহারা অপরাপর মানুষকে তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, বৃহস্পতি ও সোমবারের রোজায় মশগুল দেখিয়া নিজেরাও উহাতে শরীক হয়, যেন লোকেরা তাহাদিগকে অলস ও সাধারণ মানুষের দলভুক্ত মনে করিতে না পারে। এই লোকদিগকেই যদি একাকী ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা এইসব আমলের কিছুই আদায় করিবে না। অনুরূপভাবে আশুরা, ইয়াওমে আরাফা ইত্যাদি দিবসসমূহে প্রচণ্ড পানির পিপাসা থাকা সত্ত্বেও কেবল এই আশংকায় পানি পান না করা যে, মানুষ দেখিতে পাইলে মনে করিবে- এই ব্যক্তি আজ রোজা রাখে নাই। অর্থাৎ লোকেরা তাহার সম্পর্কে এমন ভুল ধারণা পোষণ করিতেছে যে, সে রোজা রাখিয়াছে। আর মানুষের এই ভুল ধারণা বহাল রাখার জন্যই সে খানাপিনা ত্যাগ করিয়াছে। আবার কতক লোক প্রচণ্ড গরমের সময়ও কেবল 'রোজাদার' আখ্যা পাওয়ার জন্য পানি পান করে না। আবার অনেক সময় যদিও নিজেকে স্পষ্ট ভাষায় রোজাদার বলিয়া প্রকাশ করা হয় না, কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করা হয় এবং এমন শব্দ ব্যবহার করা হয় যাহা দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় যে, সে রোজা রাখিয়াছে। এই ব্যক্তি এক সঙ্গে দুইটি অপরাধ করিতেছে- প্রথমতঃ আকারে ইঙ্গিতে নিজেকে রোজাদার বলিয়া দাবী করিতেছে; দ্বিতীয়তঃ সে নিজেকে বে-রিয়া ও সাধু মনে করিতেছে। এই ব্যক্তির বিভ্রান্তি হইল- সে মনে করিতেছে, আমি নিজের এবাদত জাহির করি নাই। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে নিজের এবাদত জাহির করিয়া রিয়াকার সাব্যস্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তির পানির পিপাসা যখন প্রকট হয় এবং সবর করিবারও ক্ষমতা থাকে না, তখন ইশারা-ইঙ্গিতে বা সরাসরি কোন ওজর পেশ করিয়া পানি পান করিয়া লয়। যেমন নিজেকে এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করে- যেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে প্রচণ্ড পিপাসা পায় এবং যেই ব্যাধির কারণে রোজা রাখা ক্ষতিকর হয়। কিংবা এমন ওজর পেশ করে যে, আজ আমি অমুক ব্যক্তির মন রক্ষার্থে রোজা ভঙ্গ করিয়াছি- ইত্যাদি। আবার কতক লোক এমনই সতর্ক হয় যে, পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গেই ওজর পেশ করে না- যেন মানুষ তাহাকে কোনভাবেই রিয়াকার মনে করিতে না পারে। বরং কিছু বিলম্বের পর অপর কোন প্রসঙ্গের আবরণে রোজা ভঙ্গের কারণ উত্থাপন করে। যেমন সে হয়ত বলিল, অমুক ব্যক্তি নিজের দোস্ত-আহবাবের সঙ্গে গভীর মোহাব্বতের সম্পর্ক রাখে। খানা-খাওয়ার সময় তাহার প্রচণ্ড রকমের চাহিদা হইল- তাহার কোন না কোন দোস্ত অবশ্যই তাহার সঙ্গে খানায় শরীক হইতে হইবে। আজ আমিও